শ্রীরামকৃষ্ণের

যাঁরা এসেছিল সাথে

স্বামী অমিতানন্দ

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা—১২

দাম: দুই টাকা

কলকাতা, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট থেকে শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক
প্রকাশিত ও ১৫-এ, ক্ষুদিরাম বসু রোড, সাধারণ প্রেস লিঃ থেকে
শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক মুদ্রিত

গুরুদেব

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে—

ভূমিকা

মহাপুরুষদের জীবনী লেখা কঠিন। ছোটদের জন্যে লেখা তো আরও কঠিন। স্বামী অমিতানন্দ এ বিষয়ে অনেকখানি সফলতা অর্জন করেছেন। 'কিশোর বাংলায়' মহাপুরুষদের জীবনের নানা ঘটনা নিয়ে তাঁর অনেকগুলো লেখা প্রকাশিত হয়েছে। দেখে খুশী হয়েছি তাঁর লেখাগুলোর প্রত্যেকটিই বাংলার কিশোর-মহলে যথেষ্ট সমাদর পেয়েছে।

স্বামী অমিতানন্দ দীর্ঘকাল ছোটদের গ্রন্থাগার পরিচালনা করেছেন। তিনি ছোটদের ভালবাসেন, ছোটরাও তাঁকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আপনার করে নেয়। গ্রন্থাগার ও ছোটদের নানা আনন্দ-অনুষ্ঠান পরিচালনার মধ্য দিয়ে তিনি অতি সহজে শিশু-মনের সংগে পরিচিত হয়েছেন এবং সন্ন্যাসিসুলভ ভালবাসাই তাঁর মনকে ছোটদের একজন প্রকৃত দরদী করে তুলেছে। এ জন্যেই তাঁর লেখা এত সার্থক হয়ে ওঠে।

নতুন বাংলার গোড়াপত্তন হয় বিবেকানন্দের আবির্ভাবে। রামকৃষ্ণ ছিলেন এ যুগের অধিদেবতা। রামকৃষ্ণ ও তাঁর রচিত জীবনীগুলো উপহার দিয়ে অমিতানন্দজী তাই অতি সুন্দর কাজ করেছেন। শুধু ছোটরা নয়, তাদের মা বাবা শিক্ষক সকলের কাছেই এই বইখানি সমাদর পাবে।

অরূপ

নিবেদন

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাথে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের সংগে বাংলার ভাই-বোনদের পরিচয় করে দেবার সুযোগ আমার হল। ফুল তুলে এনে ঠাকুরের পূজো করে প্রসাদী ফুল বাংলার ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দিলুম।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক বাংলার একটি গৌরবময় যুগ। এ যুগের যাঁরা স্রষ্টা, তাঁদের ভাবধারা ও জীবনের আদর্শ কেবল বাংলা দেশে নয়, সারা ভারতে নব জাগরণের প্রেরণা উদ্বুদ্ধ করেছিল। সেই যুগের ভারতকে জানতে হলে সেই যুগের মহাপুরুষদের জীবনীও জানা প্রয়োজন। তাঁদের কাছে বর্তমান ভারতের নরনারীর ঋণ অপরিশোধ্য।

ছোটদের জন্যে এই জীবন-চয়নিকা রচনা করতে বসে দেখলুম যত সহজ মনে হয়েছিল, তত সহজ নয়। মহাপুরুষদের জীবনী লেখা বড়ই কঠিন। কারণ তাঁদের প্রতিভার বিকাশ কোন একটি নির্দিষ্ট পথ ধরে চলে না। তাঁদের চিন্তাধারা সূর্যকিরণের মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আমাদের জীবনীশক্তি আর ইতিহাসকে নতুন রূপে সৃষ্টি করে। তাঁদের জীবনের আদর্শ ও কর্মকে সাহিত্যের আকারে কিশোরদের হাতে দিতে হলে ভাষা হওয়া চাই সহজ এবং ভাবটি হওয়া চাই সরল। অথচ দু'টি বিষয়ই কঠিন। তবু লেখার সময় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে চেষ্টা করেছি। জানি না, ছোট ছোট ভাইবোনদের কতদূর ভাল লাগবে।

এ বইএ রামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যদের ও গৃহী শিষ্য চার জনের জীবনী দেওয়া হয়েছে। রামকৃষ্ণদেবের গৃহী শিষ্য আরও অনেক আছেন, তাঁদের কথা দেওয়া সম্ভব হল না। আর একটি বিষয় উল্লেখ করা

প্রয়োজন যে, এখানে শ্রীমা ও মহিলা ভক্তদের কথা দেওয়া হয় নি। তাঁদের কথা পৃথক ভাবে প্রকাশ করার ইচ্ছা রইল।

যে সব মহাপুরুষদের জীবনী দেওয়া হয়েছে, তাঁদের আদর্শ ও আচরণ গ্রহণ করে ছেলেমেয়েরা যদি তাদের জীবনকে আদর্শময় করে তুলতে পারে, তবেই বুঝব আমার এ বই লেখার উদ্দেশ্য ও পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।

বই লিখতে যাঁরা উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়ে সাহায্য করেছেন, তাঁদের কাছে আমি ঋণী। তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাঁদের নাম রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কিশোর বাংলা, স্বামী সোমেশ্বরানন্দ, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও বটকৃষ্ণ সেন।

এতে আছে

শ্রীরামকৃষ্ণের

যাঁরা এসেছিল সাথে

*

* *

সত্যাশ্রয়ী ক্ষুদিরাম

—ভাল করলে না বামুনঠাকুর, আর একবার ভাল করে ভেবে দেখ। জান তো হুজুরকে। তাঁর হয়ে সাক্ষ্য না দিলে তিনি তোমায় ভিটে ছাড়া করবেন।

জমিদারের নায়েব এসে ক্ষুদিরামকে শাসিয়ে গেল।

হুগলী জেলার দেরে গ্রামের জমিদার রামানন্দ রায় ভারী বদরাগী লোক। সামান্য কোন কারণে কারুর ওপর অসন্তুষ্ট হলে তাকে তিনি সর্বস্বান্ত করে ছাড়তেন। প্রজাদের ওপর অত্যাচার করে, মিথ্যে মামলা এনে তাদের উৎপীড়ন করাই যেন তাঁর নিত্যকার কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

একবার কোন এক প্রজার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে জমিদার রামানন্দ রায় তার বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা দায়ের করেন।

মামলা নির্ভর করে সাক্ষীর ওপর। এ মামলায় ভাল সাক্ষী ছিল না। তাই এমন একজন সাক্ষীর দরকার হল,—যাকে সবাই সত্যবাদী বলে শ্রদ্ধা করে।

ক্ষুদিরামের সত্যনিষ্ঠার কথা সকলেরই জানা ছিল। কাজেই সে সুযোগ

জমিদার ছাড়বেন কেন ? ক্ষুদিরাম যাতে তাঁর হয়ে সাক্ষ্য দেন সেজন্যে তিনি তাঁকে তলব করে পাঠালেন।

ক্ষুদিরাম জমিদার বাড়ি এসে জানতে পারলেন তারই প্রতিবেশী, তারই মত আর একজন গরিবের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে হবে,—তাও আবার মিথ্যে করে। তিনি রাজী হলেন না।

জমিদার টাকা, পয়সা, জমিজমা দেবেন বলে কত কি লোভ দেখালেন, কিন্তু কোন কিছুতেই তাঁকে টলাতে পারলেন না। জমিদারের নায়েব এসে সত্যনিষ্ঠ ক্ষুদিরামকে কত কি ভয় দেখিয়ে গেল।

খুব বেশী দিনের কথা নয়। দুশো বছর আগে হুগলী জেলার দেরে গ্রামে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি ছিল। ক্ষুদিরামের মত ধর্মনিষ্ঠ ও সদাচারী ব্রাহ্মণ খুব কমই দেখা যায়। তিনি রোজ ভগবান রামচন্দ্রের উপাসনা করতেন। দেবতার সেবায় তাঁর নিষ্ঠা ও ভক্তির পরিচয় পেয়ে দেরে গ্রামের সকলেই তাঁকে খুব শ্রদ্ধা ও সম্মান করত।

ভাল সাক্ষী না পাওয়াতে জমিদার রামানন্দ রায় সেই মামলায় জিততে পারলেন না। মামলায় হেরে গিয়ে তিনি ক্ষুদিরামের ওপর রেগে আগুনের মত লাল হয়ে উঠলেন। তাঁকে জব্দ করার জন্যে তিনি উপায় খুঁজতে লাগলেন। অবশেষে তিনি কৌশলে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা রুজু করলেন।

জমিদার রামানন্দ মামলাবাজ লোক। কি করে এ সব কাজে লোককে জব্দ করা যায় তিনি তা বেশ ভালই জানেন। এ রকম চতুর ব্যক্তির সংগে ক্ষুদিরাম পারবেন-ই বা কি করে ? তিনি মামলায় হেরে গেলেন।

জমিদার মোকদ্দমায় জয়লাভ করে ক্ষুদিরামের জমিজমা ও ঘরবাড়ি সব কেড়ে নিয়ে তাঁকে সর্বস্বান্ত করে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

ভগবানের নাম করে ছেলেমেয়ের হাত ধরে ক্ষুদিরাম একেবারে পথে এসে দাঁড়ালেন। স্ত্রী চন্দ্রাদেবীও ছিলেন ঠিক ক্ষুদিরামেরই মত। তিনি বললেন, চল, এ গাঁয়ে আর থাকব না।

ক্ষুদিরাম ছেলেমেয়ের হাত ধরে, গাঁ ছেড়ে পৈত্রিক ভিটে ছেড়ে, হাঁটতে আরম্ভ করলেন। সংগে নিলেন উপাস্য দেবতা রঘুবীরকে।

ক্রোশ খানেক দূরে কামারপুকুর গ্রাম। সেই গ্রামে সুখলাল গোস্বামী নামে ক্ষুদিরামের একজন বন্ধু ছিলেন। গোস্বামী বন্ধুর বিপদের কথা শুনে বাড়ির একদিকে তাঁদের থাকবার জায়গা করে দিলেন।

বাড়ির সংগেই ছিল খানকয়েক চালাঘর। গোস্বামী তা দানপত্রে লিখে দিলেন ক্ষুদিরামের নামে। ক্ষুদিরাম অকূলে কূল পেলেন।

শুধু থাকবার ঘর হলেই সংসার চলে না। আরও অনেক কিছু দরকার হয়। কিন্তু ক্ষুদিরামের যে কিছুই নেই। বন্ধু সুখলাল কিছু ধানের জমি দান করে তাঁর সংসার চলারও ব্যবস্থা করে দিলেন। অসময়ের বন্ধুই যে প্রকৃত বন্ধু, সুখলাল গোস্বামী তা প্রমাণ করলেন।

দশ বছরের ছেলে রামকুমার ও চার বছরের মেয়ে কাত্যায়নীকে সংগে নিয়ে ক্ষুদিরাম মহানন্দে বাস করতে লাগলেন বন্ধুর দেওয়া নতুন ঘরে।

জমিতে চাষবাস করে বছরের শেষে ফসল যখন ঘরে আনা হল তখন দেখা গেল, ধান যা হয়েছে তাতে তাঁদের সারা বছর চলে গিয়েও উদ্বৃত্ত থাকবে।

ক্ষুদিরাম তাতেই সন্তুষ্ট। দেব দ্বিজ আর অতিথি সেবায় আত্মসমর্পণ করে ভুলে গেলেন, কে কবে করেছিল অত্যাচার, কে কবে করেছিল তার অনিষ্ট।

একদিন কোন একটা দরকারী কাজে যেতে হয়েছিল তাঁকে কোন দূর গ্রামে। সেখান থেকে ফিরতে হয়ে গেল বেলা। মধ্যাহ্ন সূর্য পশ্চিম

আকাশে ঢলে পড়েছে। প্রখর রৌদ্রতাপে ক্লান্ত হয়ে ক্ষুদিরাম আশ্রয় নিলেন এক গাছতলায়। জনমানবহীন ফাঁকা মাঠের নির্মল বাতাস তাঁর দেহ-মন ঠাণ্ডা করে দিলে। শরীরের অবসন্নতায় তাঁকে নিদ্রায় অভিভূত করে তুলল এবং ধীরে ধীরে সেখানে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

মাঠের চারদিকে ধানের ক্ষেত। মাঝে মাঝে বাতাস এসে সবুজ ক্ষেতে ঢেউ খেলে যায়। পাড়াগাঁয়ের এ দৃশ্য বড়ই মধুর!

ক্ষুদিরাম ঘুমের ঘোরে দেখেন স্বপ্ন। ভারী অদ্ভুত স্বপ্ন—অপূর্ব, স্বর্গীয়। অভীষ্ট দেবতা শ্রীরামচন্দ্র দিব্যবালক বেশে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত।

—বৎস, আমায় নিয়ে চল। বহুদিন যাবৎ অনাহারে অযত্নে পথের ধারে পড়ে আছি। তোমার সেবা পাবার ইচ্ছা হয়েছে আমার।

বলেই দেবতা অদৃশ্য হলেন।

স্বপ্নের ঘোরে তিনি চমকে ওঠেন এবং সংগে সংগে ঘুম গেল তাঁর ভেঙে। সারা দেহ মন দিব্যজ্যোতিতে ভরে উঠল তারই আনন্দে।

—একি অদ্ভুত স্বপ্ন! এও কি সম্ভব? স্বপ্ন কি কখনও সত্যি হয়? সত্যি কি ঠাকুর আমার আসবেন?

ক্ষুদিরাম ভাবছেন, এমন সময় দৃষ্টি পড়ল তাঁর ধান ক্ষেতের মধ্যে। খুব বেশী দূরে নয়, দু' তিন গজ দূরে একটি সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, আর তারই নীচে ক্ষুদিরামের স্বপ্নে দেখা রঘুবীর শালগ্রাম শিলা।

ক্ষুদিরাম আনন্দে অধীর হয়ে সেখানে ছুটে গেলেন। তিনি কাছে যেতেই সাপ আস্তে আস্তে চলে গেল। রঘুবীরকে বুকে তুলে নিয়ে আনন্দে নাচতে নাচতে তিনি বাড়ি ফিরে এলেন।

বাড়ির গা ঘেঁসে চলে গেছে একটা পথ। সে পথ দিয়ে কত সাধু

সন্ন্যাসী তীর্থযাত্রী রোজ যাতায়াত করেন। এসব যাত্রী প্রায়ই ক্ষুদিরামের বাড়িতে এসে পথশ্রম লাঘব করতেন। অতিথিরূপে তাঁদের সেবা করে পরমানন্দ লাভ করতেন ক্ষুদিরাম আর চন্দ্রাদেবী।

বিশ্রামের পর যাত্রীরা চলে যান। তীর্থে যাবার বাসনা প্রবল হয়ে চলে যায় ক্ষুদিরামের মন তাঁদের সংগে যেখানে আছে তীর্থ-দেবতা। কিন্তু রঘুবীর আর সংসার তাঁকে আটক করে রাখে।

এভাবে দিন যায়। ক্রমে ক্ষুদিরামের বয়স হল ষাট। তিনি স্থির করলেন আর দেরি নয়। এবার যেতেই হবে। বহুদিনের মনের সাধ, গয়াধামে গদাধরের পাদপদ্মে পিতৃপুরুষদের তর্পণ করে তৃপ্তিলাভ করবেন। ছেলে মেয়ের হাতে সংসার আর রঘুবীরের পূজোর ভার দিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন পায়ে হেঁটে গয়া তীর্থে।

গয়াধামে গদাধরের পাদপদ্মে পিতৃপুরুষদের তর্পণ শেষ করে পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হয়ে আনন্দে নেচে উঠল তাঁর মন।

ক্ষুদিরাম রাত্রে শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখেন, তিনি যেন গদাধরের পায়ে তর্পণ করছেন। এমন সময় সমস্ত মন্দির আলোয় আলোময় হয়ে উঠল। স্বর্গের সব দেবতারা মিলে যেন তাঁর অর্ঘ্য গ্রহণ করছেন। দেবতারা মণ্ডলের মত ঘিরে একজন জ্যোতির্ময় পুরুষকে পূজো করছেন। তিনি দেখলেন মণ্ডলের মধ্যেই সেই পুরুষ, তাঁরই ইষ্টদেবতা ভগবান শ্রীরামচন্দ্র।

—দেবতা যেন তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে চান। ক্ষুদিরাম করজোড়ে কিছু বলতে উঠলেই তাঁকে লক্ষ্য করে তিনি বলতে থাকেন, ক্ষুদিরাম, তোমার সেবায় তোমার ভক্তিতে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার ছেলে হয়ে তোমার ঘরে আসব।

ঘুম ভেঙে গেলে বিস্ময়ে অবাক হয়ে ক্ষুদিরাম স্তম্ভিত হয়ে রইলেন।

মনে মনে ভাবলেন, এও কি সম্ভব ? এ গরিবের ঘরে তিনি কি জন্ম নেবেন ?

ফাল্গুন মাসের একদিন শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ার চাঁদ আকাশে ওঠে খানিক পরেই আবার মিলিয়ে গেছে। এমনি সময় আঁতুড় ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ধাইমা ধনী কামারনী আনন্দে বলে উঠল, ওগো, শাঁখ বাজাও।

ক্ষুদিরাম বুঝলেন ছেলে হয়েছে। গয়াতীর্থের কথা স্মরণ করে পরে ছেলের নাম রাখলেন, গদাধর। রামকৃষ্ণদেবের শুভাগমন হয়েছিল এমনি-ভাবে বাংলার এক ছোট্ট গ্রামে।

শরৎকাল। আনন্দময়ীর পুজোর আয়োজন চলেছে রামচাঁদের বাড়িতে। মহা ধুমধাম, আনন্দের রোল বয়ে চলেছে। এই আনন্দোৎসবে মামাকে না আনলে চলে না। রামচাঁদ তাঁর মামা ক্ষুদিরামকে আনার জন্যে তাঁর বাড়িতে লোক পাঠালেন।

ক্ষুদিরাম বড়ছেলে রামকুমারকে সংগে নিয়ে রামচাঁদের বাড়ি সেলামপুরে এলেন।

শরত্তকালের ভোর বেলা।

বট অশ্বথ নিম ও আমগাছের ডালে ডালে পাখীদের কলরব জেগে উঠেছে। ঘরের চালে বসে কাক ডেকে যাচ্ছে,—কা, কা, জাগ জাগ।

ঘুমন্ত গ্রামের বুকে জাগরণের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা সাজি হাতে করে বেরিয়ে যায় মায়ের পুজোর ফুল তুলতে। পল্লীবধুরা গৃহকর্ম আরম্ভ করেছেন, বুড়োরা পূজোর আয়োজনে মেতে পড়েছেন।

দুপুরে মহা ধুমধামে মায়ের পুজো হয়। পুজোর পরে ছেলেমেয়েরা আনন্দ করে প্রসাদী নাড়ু, মুড়ি মুড়কি খায়।

সন্ধেবেলায় ঢাক ঢোল বাজিয়ে আরতি হয়। আরতির পর চলে গান-বাজনা, আর খোল করতাল বাজিয়ে বুড়োরা করেন সংকীর্তন। হরিনাম সংকীর্তনে অথবা শিবের গাজনে ধনী গরিব, ছোট বড় সবাই মিলে করে আনন্দ।

এমনি ভাবে পূজোর প্রথম দু দিন বেশ আমোদ প্রমোদে কেটে গেল। নবমী পূজোর কাজ শেষ করে ক্ষুদিরাম হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সকলের মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়ে দেখা দিল কালবৈশাখীর প্রতিচ্ছবি।

বিজয়া দশমীর রাত্রে মাটির প্রতিমা ভাসিয়ে দিয়ে রামচাঁদ মামার ঘরে ঢুকে দেখেন, মামাও মায়ের সংগে যাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন।

—ঐ দেখ কি সুন্দর রথ! ঐ রথে করে আমি মায়ের সংগে যাব।

বলতে বলতে ক্ষুদিরাম চপল বালকের মত ছট্ ফট্ করতে. করতে ঘুমিয়ে পড়লেন।

এ ঘুম থেকে মানুষ আর জাগে না। ক্ষুদিরামও আর জাগলেন না। এমনিভাবে পৃথিবীর খেলা শেষ করে তিনি আনন্দময়ী মায়ের সাথে অমরধামে প্রস্থান করলেন।

যার সত্যনিষ্ঠা আছে, সে সত্যের ভগবানকে পায়। যার সত্যনিষ্ঠা আছে, মা তার কথা কখনও মিথ্যা হতে দেন না। —শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

দক্ষিণেশ্বর গংগার তীরে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। ওপারে দু-একটি আলো জ্বলে ওঠেছে। এ পাড়ে আঁধার রাতে এক পাগল বলে বেড়ায়, কই, আজকের দিন তো চলে গেল, আজও তো এলি না মা।

সন্ধেবেলায় গ্রামবাসীরা সে পথ দিয়ে চলে যায়, আর পাগলের কান্না শুনে থমকে দাঁড়ায়। পরে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, আহা, মা মারা গেছে বেচারার।

সারারাত না ঘুমিয়ে ভূতের মত গংগার ধারে ধারে ঘুরে বেড়ায়। কখনো হাসে কখনো কাঁদে, কখনো ধূলোয় পড়ে লুটোপুটি খায়, আর মুখে শুধু সেই এককথা—দেখা দে, দেখা দে মা। এইভাবে দিনের পর রাত, রাতের পর দিন সেই পাগল কেঁদে কেঁদে আকুল হয়, তবু সে মায়ের দেখা পায় না।

আর একদিন সন্ধেবেলায় মন্দিরে পুজো করতে বসে পাগল এইভাবে কাঁদে, অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করে মাটিতে গড়াগড়ি দেয়, মেঝেতে মুখ ঘষে মুখ দিয়ে রক্ত বার করে। লোকে মনে করে শূল ব্যথায় ভুগছে।

এই ঘটনাটি হচ্ছিল দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীমন্দিরে। কালীমন্দিরের দেয়ালে একটা খাঁড়া ঝুলানো ছিল। পাগল লাফ দিয়ে ওঠে খাড়াটি তুলে নিলে।

—তুই যদি দেখাই দিবি না মা, তবে আমিও এ-প্রাণ আর রাখব না। এই খাড়াতেই আজ শেষ করে দেব আমার সমস্ত জ্বালা।—বলেই খাড়াটি তুলে যেই নিজের ঘাড়ের ওপর বসাবে, এমনি সময় সারাঘর আলো হয়ে গেল, আর সেই আলোয় মধ্যে ফুটে উঠল মায়ের মধুর হাসিভরা মুখখানি।

নিমেষের মধ্যে সব ওলট পালট হয়ে গেল। তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়ে

গেলেন মাটিতে। সকলে বিস্ময়ে অবাক হয়ে দেখে, এ পাগল তো পাগল নয়, এ যে ভাবের পাগল। পুরো একটা দিন যাবার পর জ্ঞান হলে শোনা গেল, মিন মিন করে শুধু বলছে,—মা মা মা।

এখন থেকে ঠাকুর আর পূজারী সম্পর্ক রইল না। এতদিন যাঁকে মনে হত মাটির দেবতা আজ তা মনে হয় না। এ যেন জ্যান্ত মানুষ, রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ জননী।

তোমরা ঠাকুর দেবতা দেখেছ, পূজারীও দেখেছ অনেক। এ ভাবে মাটির দেবতাকে জাগিয়ে তাঁর সংগে কথা বলে, অবদার করে, মা ছেলের মত থাকতে দেখেছ কি কখনও?

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নাম শুনেছ সকলেই। তিনিই এভাবে মাটির দেবতাকে সত্যিকারের দেবতা করে অমর হয়েছেন সারা পৃথিবীতে। এতদিন যারা হিন্দুর দেবদেবীকে পুতুল পূজা বলে অবজ্ঞা করে এসেছে, তাদের চোখ খুলে দিয়ে তিনি দেখিয়ে দিলেন—আমাদের দেবতা কখনও মিথ্যে হয় না।

যে মহাপুরুষের জীবন এমনি সুন্দরভাবে গড়ে উঠেছিল তিনি ছেলে-বেলায় কি রকম ছিলেন সে-সব কাহিনী জানতে তোমাদের খুবই ইচ্ছে করে না? এখন তোমাদের কাছে তাঁর বাল্যজীবনের কয়েকটি ঘটনা বলব।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আগে নাম ছিল গদাধর চট্টোপাধ্যায়, এ কথা আগেই বলেছি। তাঁর ডাক-নাম ছিল গদাই।

ছেলেবেলায় সবাই একটু আধটু দুষ্টুমি করে থাকে। কেউ কেউ আবার বেশী দুষ্টুমিও করে। গদাইও কম দুষ্ট ছিল না। চার বছর বয়স থেকেই সে দুরন্তপনায় সকলকে টেক্কা দিতে পারত। দুরন্ত হলেও সে কিন্তু অন্য ছেলেদের মত কোন জিনিস নষ্ট করত না। কাদা মাটি

দিয়ে ঠাকুর গড়ে, গাছের ফুল ছিঁড়ে এনে চোখ বুঁজে পুজো করতে বসত।

গদাইএর বাবা যখন পুজো করতে বসে পুজোর মন্ত্র পড়তেন, গীতা ও চণ্ডীপাঠ করতেন, তখন সে আড়াল থেকে সে-সব শুনত এবং সেই রকম করে মন্ত্র পড়ত।

পাঁচ বছর বয়সে গদাইকে হাতে খড়ি দিয়ে গ্রামের পাঠশালায় পাঠানো হল। পাঠশালায় পণ্ডিতমশাই যখন যে পড়া পাঠ করে একবার শুনিয়ে দিতেন গদাই তা মনে করে রাখত। বই না পড়েই পরদিন সে সব পড়া বলে যেতে পারত। বড় বড় সংস্কৃত শ্লোক একবার পড়লেই তাঁর মুখস্থ হয়ে যেত। রামায়ণ মহাভারতের গল্প শুনলে যেমনটি শুনেছে তেমনি-ভাবে হুবহু বলে যেতে পারত। তাঁর অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি দেখে পণ্ডিত অবাক হয়ে যেতেন।

কিন্তু এত স্মরণশক্তি যার আছে সে কিছুতেই নামতা মুখস্থ করতে পারত না। নামতার নাম শুনলেই যেন তাঁর মুখ শুকিয়ে যেত। এ বড়ই অদ্ভুত ঠেকত পণ্ডিতের কাছে। তিনি কিছুতেই এটি বুঝতে পারতেন না।

এক-একদিন বিকেলবেলায় গদাই তাঁর বন্ধুদের নিয়ে আম বাগানে খেলা করতে যেত। তাদের খেলা হল—যাত্রায় যেমন দেখেছে তেমনি কেউ হত রাধা, কেউ হত কৃষ্ণ। গদাই একাই সকলের কথা বলে যেত। আড়াল থেকে গ্রামবাসীরা শুনে অবাক হয়ে যেত। পরে সকলেই আদর করে বাড়ি নিয়ে যেত এবং তাদেরও সেভাবে শোনাতে বলত। বালক আবৃত্তি করে শোনাত।

ব্রাহ্মণের ছেলে গদাই। পৈতে দেবার বয়স হলে তাঁর দাদা রামকুমার সব ব্যবস্থা ঠিক করে ফেললেন। গদাইএর পৈতে হয়ে গেল।

উপনয়নের সময় একটা নিয়ম আছে, যজ্ঞ হবার পর ব্রহ্মচারীর বেশে

সকলের কাছে ভিক্ষে করতে হয়। যার কাছ থেকে ভিক্ষে গ্রহণ করবে তিনি আবার ব্রাহ্মণ হওয়া চাই, অন্য জাত হলে চলবে না। কিন্তু গদাইএর বেলা হল মুশকিল। সে চায় ধনী কামারনীর কাছে ভিক্ষে নিতে।

ধনী কামারনী গদাইএর জন্মের সময় আঁতুড় ঘরে ধাত্রীর কাজ করেছিল, তা আগেই বলেছি। গদাই বড় হলে তাকে ধাই-মা বলেই ডাকত। ধাই-মা গদাইকে খুব ভালবাসত। ধনী কামারনী তাঁকে বলেছিল, বাবা গদাই, তোমার পৈতের সময় কিন্তু আমি তোমাকে ভিক্ষে দেব।

গদাইও রাজী হল।

বড়দা রামকুমার দেখলেন গদাই যদি ধনীর কাছে ভিক্ষে নেয় তবে আমাদের জাত যাবে। কারণ ধনী নিচু জাতের মেয়ে। কাজেই তিনি তাতে রাজী হতে পারলেন না। কিন্তু গদাই তার কাছে যাবেই। কোন বাধা সে মানবে না। দাদা তাঁকে কত বোঝালেন, কিছুতেই কিছু হল না। সে বলে, ব্রাহ্মণ হয়ে যদি কথা ঠিক রাখতে না পারি, তবে ব্রাহ্মণ বলে আমরা পরিচয় দিতে পারি না।

যুক্তিতে দাদা তার কাছে হেরে যান। গদাই ধাই-মা ধনীর কাছে ভিক্ষে নিলে। গদাই বড় হলে কলকাতায় চলে আসেন এবং কিছুদিন পর দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীমন্দিরের পূজারীর কাজে নিযুক্ত হন। দক্ষিণেশ্বরে অনেক কঠোর সাধনা করে রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে জগৎবিখ্যাত হন। এ সব কাহিনী বড় হয়ে তোমরা পড়ো।

ছেলেদের অত ভালবাসি কেন, জান? ছেলেবেলা তাদের মন নিজের কাছে থাকে। ছেলেবেলায় ঈশ্বর লাভের চেষ্টা করলে, তারা সহজে তাঁকে লাভ করতে পারে। —শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী বিবেকানন্দ

ভূমধ্য সাগর।

ঢেউএর পর ঢেউ সমুদ্র তোলপাড় করছে। ঢেউএর মাথায় টলতে টলতে একটি জাহাজ চলেছে ভারতের দিকে। সেই জাহাজে ভারত মাতার ত্যাগী এক বিজয়ী বীর সমুদ্রের প্রাণশক্তি হৃদয়ে নিয়ে মায়ের বুকে ফিরে আসছে।

জাহাজে বহুলোক। তার মধ্যে সেই সন্ন্যাসী বুকে বল, হৃদয়ে আশা, চোখে স্বদেশের স্বপ্ন নিয়ে চলেছেন দেশের দিকে। জাহাজে দিনগুলি বেশ আমোদেই কেটে যাচ্ছে।

একদিন দু জন খৃস্টান মিশনরী তাঁর সংগে ধর্মালোচনা করতে এলো। তারা হিন্দুধর্মের নিন্দে করতে লাগল। যুবক সন্ন্যাসী তাঁদের প্রশ্নের জবাবে ঠিক ঠিক ভাবে উত্তর দিতে থাকেন। তিনি যখন তাঁদের ধর্মের বিষয় প্রশ্ন করতে থাকেন, তখন তারা তার কোন সদুত্তর দিতে না পেরে লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে হিন্দুধর্ম ও ভারতবাসীর সম্বন্ধে যা খুশী তাই বলে যেতে লাগল। তখন বীর সন্ন্যাসী মাতৃভূমির নিন্দে আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি সিংহের ন্যায় গর্জে উঠে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, এবং তাদের মধ্যে একজনের টুটি ধরে বললেন, ফের যদি আমার ধর্মের নিন্দে কর তবে জাহাজ থেকে জলে ফেলে দেব।

পাদরী দু জন তখন ভয়ে ভেড়ার মত কাঁপতে কাঁপতে কাতরভাবে বলতে থাকে, এবার আমাদের ছেড়ে দিন, আর কখনও ওরকম করব না।

এই তেজস্বী নবীন সন্ন্যাসীটি কে জান? তিনি হলেন ভুবনবিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দের ছোট বেলার নাম নরেন। তাঁর বাবা হলেন

বিশ্বনাথ দত্ত। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নী ছিলেন। মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী শিব পূজো করতেন। কাশীর বাবা বিশ্বনাথের কাছে প্রার্থনা করে নরেনকে পেয়েছিলেন বলে তাঁর নাম রাখলেন বীরেশ্বর। ডাক নাম হল বিলে। পরে নামকরণের সময় তার নাম হল নরেন্দ্রনাথ। বড় হলে ভুবনেশ্বরী দেবী তাঁকে নরেন বলেই ডাকতেন।

মায়ের কোলে বিলে নরেন শুক্লপক্ষের চাঁদের মত দিন দিন বেড়ে উঠতে লাগল।

বিলে পাড়ার মধ্যে নামকরা দুষ্টু ছেলে। তাঁর দুরন্তপনায় সকলেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। বয়সের সংগে সংগে তাঁর দুষ্টুমি আরো বেড়েই চলল। সমস্ত বাড়ি একাই সে তোলপাড় করে তোলে। যা বায়না ধরবে তা চাই-ই, কোন কথা শুনবে না, কোন ধমক মানবে না, কোন আদরে ভুলবে না। যা বায়না ধরবে যতক্ষণ তা না পাবে, বাড়ি মাথায় করে তুলবে। কে তাঁকে থামাবে। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য বিলে যখন রেগে উঠে চেঁচাত তখন তাঁর মা শিব শিব বলে মাথায় জল দিলেই ঠাণ্ডা হয়ে যেত।

বিলের বাবা বিশ্বনাথ দত্ত একজন নামকরা লোক। তাঁর বৈঠকখানায় অনেকগুলো হুঁকো থাকত। এক-এক জাতের জন্য এক-একটা পৃথক হুঁকো। বিলে শুনলে, একজাতের হুঁকোয় আরেক জাতের লোক তামাক খেলে জাত যায়।

একদিন বিলে বৈঠকখানায় ঢুকে একটা একটা করে সব কটা হুঁকো খেয়ে দেখতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ তাঁর বাবা ঘরে ঢুকে দেখে অবাক হয়ে যান। বাবা জিগগেস করলেন, কি হচ্ছেরে বিলে?

সে বললে, দেখলুম আমার জাত যায় কিনা?

কালে যিনি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সারা ভারত আন্দোলন করবেন, তাঁর ভেতর শিশু বয়সে এটা দেখতে পেয়ে আমরা আশ্চর্য্য হয়ে যাই না কি?

একবার দলের ছেলেদের নিয়ে নরেন নৌকো করে গংগায় বেড়াতে যান। চাঁদপাল ঘাট থেকে নৌকো শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের দিকে চলেছে। নৌকো বহুদূর যাবার পর দলের ছেলেদের মধ্যে একজন অসুস্থ হয়ে হঠাৎ নৌকোয় বমি করে ফেলে। নৌকো পরিষ্কার করে দেবার জন্য মাঝি হুমকি দিতে থাকে। ডাঙায় উঠে মেথর দিয়ে পরিষ্কার করে দিতে চাইলেও মাঝি তাদের কথা শোনে না। মারধোর করবে বলে ভয় দেখায়। ছেলের দল ভয়ে একজন আরেক জনের মুখের পানে তাকায়। নরেন তখন এক ফন্দি করলে। গংগার ধারে দুজন গোরা সৈন্য পায়চারি করছিল। নরেন তখন একলাফে নৌকো থেকে নেবে ঐ দুজন গোরা সৈন্যকে দু হাতে ধরে ভাঙ্গা ইংলিশে বোঝাতে বোঝাতে নৌকোর কাছে নিয়ে এল। গোরা সৈন্যদের দেখেই মাঝি তাদের ছেড়ে দিলে। নরেনের উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে বন্ধুরা তাঁকে বাহবা দিতে থাকে।

দেখতে দেখতে দুরন্ত নরেন ছ বছরে পা দিলে। বিশ্বনাথ ছেলের শিক্ষার জন্য তাকে ভর্তি করিয়ে দিলেন একটা স্কুলে। কিন্তু নরেন স্কুলের দুষ্টু ছেলেদের হাব-ভাব চাল চলন সব নকল করতে লাগল। বাবা দেখলেন, ছেলে সুশিক্ষার বদলে কুশিক্ষাই বেশী শিখেছে। ছেলেকে স্কুল ছাড়ানো হল। বাড়িতে মাস্টার রেখে তাঁর লেখা পড়ার বন্দোবস্ত করে দেওয়া হল।

মাস্টার যখন পড়ান নরেন চুপ করে চোখ বুজে থাকে। মাস্টার মশাই মনে করেন, দুষ্টু ছেলে পড়ার সময় ঘুমুচ্ছে। তিনি রেগে নরেনকে খুব ধমক লাগান। কিন্তু সে তার দোষ খুঁজে পায় না। মাস্টার মশাই যা পড়িয়েছেন হুবহু সে বলে যায়! মাস্টার বুঝতে পারেন তাঁর ভুল। তিনি অবাক হন ছাত্রের স্মৃতিশক্তি দেখে, শতমুখে তার প্রশংসা করেন।

খুব ছোট বেলা থেকেই নরেনের খুব সাহস ছিল। তাঁর সাহসের

কয়েকটি ঘটনা এখন তোমাদের বলব। ছ বছর বয়সের সময় একদিন এক-দল ছেলে নিয়ে চলেছেন চড়ক মেলায়। মেলা থেকে ফেরবার পথে তাঁদের দলের একটি ছেলে কোন কারণে ফুটপাত থেকে রাস্তায় নেমে পড়ে, ঠিক সে সময় একটি ঘোড়ার গাড়ি বেগে এসে ছেলেটির ওপর পড়ল। গেল গেল রবে চারদিক থেকে সবাই চেঁচিয়ে উঠল। নরেন পেছনে ফিরে দেখে ছেলেটি প্রায় ঘোড়ার পায়ের তলায় পড়ে পড়ে। এমন সময় লাফ দিয়ে ঘোড়ার নিচে থেকে ছেলেটিকে টেনে বার করে নিয়ে আসে। আর একটু দেরি হলে ছেলেটির যে কি হত বলা যায় না।

নরেনদের পাড়ায় এক বাড়িতে একটি বড় চাঁপা ফুলের গাছ আছে। নরেনের খেয়াল আজ দলের ছেলেদের নিয়ে ঐ গাছে চোর-বুড়ী খেলবে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। সংগীদের নিয়ে নরেন গাছে উঠে মাথা নিচের দিকে করে ঝুলে থাকে, তাতে তাদের মোটেই ভয় করে না।

বাড়ির বুড়ো কর্তা দেখলেন মহাবিপদ, দুরন্ত ছেলের দল হুল্লোট করে, পাড়া মাত করে গাছে উঠে যে ভাবে ঝুলে থাকে, গাছ থেকে পড়ে হাত পা ভেঙে কখন কি বিপদই বা করে বসে কে জানে? বুড়ো তখন ছেলে-দের ভয় দেখাবার জন্য বললেন, ওরে ঐ গাছে যে তোরা উঠিস, ওতে যে ব্রহ্মদৈত্যি থাকে জানিস? শীগগির পালা, এখনি তোদের ঘাড় মটকাবে।

ভূতের কথা শুনলে কে না ভয় পায়? যেই না বুড়োর এই কথা বলা, সব ছেলের দল পালা পালা করে ছুটে পালাল। কিন্তু নরেন কিছুতেই গেল না। সে বললে, ভারী ভীতু তো তোরা। আরে ব্রহ্মদৈত্যি যদি থাকে তা হলে এতক্ষণ আমাদের ঘাড় মটকালে না কেন? বুড়োর কথায় ভূত এসে আমাদের ঘাড় মটকাবে, এই তোদের বিশ্বাস হল? ছ্যা ছ্যা, তোরা কি রকম মানুষ বল দেখি?

একবার দলের ছেলেদের নিয়ে নরেন নৌকো করে গংগায় বেড়াতে যান। চাঁদপাল ঘাট থেকে নৌকো শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের দিকে চলেছে। নৌকো বহুদূর যাবার পর দলের ছেলেদের মধ্যে একজন অসুস্থ হয়ে হঠাৎ নৌকোয় বমি করে ফেলে। নৌকো পরিষ্কার করে দেবার জন্য মাঝি হুমকি দিতে থাকে। ডাঙায় উঠে মেথর দিয়ে পরিষ্কার করে দিতে চাইলেও মাঝি তাদের কথা শোনে না। মারধোর করবে বলে ভয় দেখায়। ছেলের দল ভয়ে একজন আরেক জনের মুখের পানে তাকায়। নরেন তখন এক ফন্দি করলে। গংগার ধারে দুজন গোরা সৈন্য পায়চারি করছিল। নরেন তখন একলাফে নৌকো থেকে নেবে ঐ দুজন গোরা সৈন্যকে দু হাতে ধরে ভাঙ্গা ইংলিশে বোঝাতে বোঝাতে নৌকোর কাছে নিয়ে এল। গোরা সৈন্যদের দেখেই মাঝি তাদের ছেড়ে দিলে। নরেনের উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে বন্ধুরা তাঁকে বাহবা দিতে থাকে।

দেখতে দেখতে দুরন্ত নরেন ছ বছরে পা দিলে। বিশ্বনাথ ছেলের শিক্ষার জন্য তাকে ভর্তি করিয়ে দিলেন একটা স্কুলে। কিন্তু নরেন স্কুলের দুষ্টু ছেলেদের হাব-ভাব চাল চলন সব নকল করতে লাগল। বাবা দেখলেন, ছেলে সুশিক্ষার বদলে কুশিক্ষাই বেশী শিখেছে। ছেলেকে স্কুল ছাড়ানো হল। বাড়িতে মাস্টার রেখে তাঁর লেখা পড়ার বন্দোবস্ত করে দেওয়া হল।

মাস্টার যখন পড়ান নরেন চুপ করে চোখ বুজে থাকে। মাস্টার মশাই মনে করেন, দুষ্টু ছেলে পড়ার সময় ঘুমুচ্ছে। তিনি রেগে নরেনকে খুব ধমক লাগান। কিন্তু সে তার দোষ খুঁজে পায় না। মাস্টার মশাই যা পড়িয়েছেন হুবহু সে বলে যায়! মাস্টার বুঝতে পারেন তাঁর ভুল। তিনি অবাক হন ছাত্রের স্মৃতিশক্তি দেখে, শতমুখে তার প্রশংসা করেন।

খুব ছোট বেলা থেকেই নরেনের খুব সাহস ছিল। তাঁর সাহসের

কয়েকটি ঘটনা এখন তোমাদের বলব। ছ বছর বয়সের সময় একদিন এক-দল ছেলে নিয়ে চলেছেন চড়ক মেলায়। মেলা থেকে ফেরবার পথে তাঁদের দলের একটি ছেলে কোন কারণে ফুটপাত থেকে রাস্তায় নেমে পড়ে, ঠিক সে সময় একটি ঘোড়ার গাড়ি বেগে এসে ছেলেটির ওপর পড়ল। গেল গেল রবে চারদিক থেকে সবাই চেঁচিয়ে উঠল। নরেন পেছনে ফিরে দেখে ছেলেটি প্রায় ঘোড়ার পায়ের তলায় পড়ে পড়ে। এমন সময় লাফ দিয়ে ঘোড়ার নিচে থেকে ছেলেটিকে টেনে বার করে নিয়ে আসে। আর একটু দেরি হলে ছেলেটির যে কি হত বলা যায় না।

নরেনদের পাড়ায় এক বাড়িতে একটি বড় চাঁপা ফুলের গাছ আছে। নরেনের খেয়াল আজ দলের ছেলেদের নিয়ে ঐ গাছে চোর-বুড়ী খেলবে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। সংগীদের নিয়ে নরেন গাছে উঠে মাথা নিচের দিকে করে ঝুলে থাকে, তাতে তাদের মোটেই ভয় করে না।

বাড়ির বুড়ো কর্তা দেখলেন মহাবিপদ, দুরন্ত ছেলের দল হুল্লোট করে, পাড়া মাত করে গাছে উঠে যে ভাবে ঝুলে থাকে, গাছ থেকে পড়ে হাত পা ভেঙে কখন কি বিপদই বা করে বসে কে জানে? বুড়ো তখন ছেলে-দের ভয় দেখাবার জন্য বললেন, ওরে ঐ গাছে যে তোরা উঠিস, ওতে যে ব্রহ্মদৈত্যি থাকে জানিস? শীগগির পালা, এখনি তোদের ঘাড় মটকাবে।

ভূতের কথা শুনলে কে না ভয় পায়? যেই না বুড়োর এই কথা বলা, সব ছেলের দল পালা পালা করে ছুটে পালাল। কিন্তু নরেন কিছুতেই গেল না। সে বললে, ভারী ভীতু তো তোরা। আরে ব্রহ্মদৈত্যি যদি থাকে তা হলে এতক্ষণ আমাদের ঘাড় মটকালে না কেন? বুড়োর কথায় ভূত এসে আমাদের ঘাড় মটকাবে, এই তোদের বিশ্বাস হল? ছ্যা ছ্যা, তোরা কি রকম মানুষ বল দেখি?

নরেনের কথায় ছেলেদের মনে সাহস ফিরে এল। তখন আবার গাছে উঠে তারা হুল্লোট আরম্ভ করে দিল।

সাত বছর বয়সে নরেনকে মেট্রোপলিটন স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয়। সেখানেও নরেন ছেলেদের নেতা হয়ে উঠলেন।

নরেন যখন পঞ্চম মানের ছাত্র সেই সময় কলকাতায় একটি বড় যুদ্ধের জাহাজ আসে। যুদ্ধের জাহাজ দেখবার জন্যে কাতারে কাতারে লোক জাহাজ ঘাটে আসতে থাকে। নরেন যে স্কুলে পড়ত সে স্কুলের ছেলেদেরও ইচ্ছা হল যুদ্ধের জাহাজ দেখতে যাবে। জাহাজ দেখতে হলে চাই জাহাজের কাপ্তেনের অনুমতি। কাপ্তেন সাহেব থাকেন চৌরঙ্গির এক বড় বাড়ির তেতালায়। সেখানে কড়া পুলিশ পাহারা। কার্ড না দেখালে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। তখনকার দিনে পুলিশকে ছেলেরা খুব ভয় করত। কাজেই বড় ছোট কোন ছেলেই সেখানে যেতে সাহস করলে না। নরেন খুব সাহসী, তাই ছেলেরা এসে তাকে ধরে বসল। নরেনও রাজী হল।

কাপ্তেনের বাড়ির ফটকে এসে দাঁড়াতেই ছেলেমানুষ দেখে প্রহরী তাঁকে তাড়া করলে। সংগের ছেলেরা সব ভয়ে পালিয়ে গেল। নরেনও রাস্তায় চলে এলেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি দেখতে লাগলেন তেতালার একটি ঘরে সবাই আবেদন পত্র নিয়ে যাচ্ছে আবার বেরিয়ে আসছে। তিনি বুঝতে পারলেন যে কাপ্তেন ঐ ঘরে আছে।

তিনি আরো দেখতে পেলেন কাপ্তেনের ঘরের পাশ দিয়ে একটি ছোট সিঁড়ি বরাবর নিচে নেমে চলে এসেছে এবং তাই দিয়ে মাঝে মাঝে খানসামা বেহারা প্রভৃতি ওঠানামা করছে। তখন তিনি সবার অলক্ষ্যে ঐ ছোট সিঁড়ি দিয়ে সাহেবের ঘরে চলে এলেন। একটা টেবিলের ওপর সায়েব বসে দরখাস্তগুলো সই করে দিচ্ছিলেন। নরেন তাঁর কাগজখানি সামনে

ধরতেই সেখানিও সই হয়ে গেল। তখন বুক ফুলিয়ে সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন। প্রহরীরা নিজেদের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

তারপর মহা আনন্দে ছেলের দল নরেনকে নিয়ে যুদ্ধের জাহাজ দেখে এল।

নরেন ছেলেদের নিয়ে কত কি খেলে—হকি ক্রিকেট হাডুডু। নরেনের আর একটি মজার খেলা ছিল, ধ্যান-ধ্যান খেলা।

মাঝে মাঝে নরেনকে খুঁজে পাওয়া যেত না, সারা বাড়িতে খোঁজ-খোঁজ রব পড়ে যেত। বাড়ির আনাচে কানাচে, ঘাটেমাঠে, এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় তাঁর খোঁজে সব হয়রান হত। শেষকালে হয়তো দেখা গেল, নরেন বাড়ির চিলে-ঘরের এক কোণে চোখ বুঁজে ধ্যানে বসে আছে।

একদিন সন্ধ্যায় নরেন তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে ধ্যান করতে বসেছে। এমন সময় একটা সাপ তাদের দিকে ছুটে আসতে থাকে। বন্ধুটি ওরে সাপ সাপ বলতে বলতে ছুটে পালাল। তার চিৎকারে সবাই ছুটে আসে। নরেন তখনও ধ্যানে বসে আছে, শরীর নিশ্চল নিথর। নরেনের ভাবনায় সব চেঁচামেচি শুরু করে দিল।

সাপকে মারবার কথা হলে জনতার মধ্য থেকে একজন বললে, সাপকে মারা ঠিক হবে না। সাপ কি করে দেখাই যাক। আগে থেকে তাকে মারতে গেলে সে রেগে নরেনকে ছোবল দিতে পারে।

কিছুক্ষণ পর সাপ আস্তে আস্তে চলে গেলে জোর করে নরেনের ধ্যান ভাঙানো হল। তাঁর মা তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, বাবা সাপকে দেখেও তোর ভয় করে না?

বিস্মিত হয়ে নরেন বলে,—সাপ? কই আমি তো দেখতে পাই নি।

প্রবেশিকা পরীক্ষার কয়েক দিন আগে নরেন দেখলেন যে, জ্যামিতির চার খণ্ড তাঁর পড়ার বাকী রয়েছে। মাঝে কিছুদিন শারীরিক অসুস্থতার

জন্যে তাঁর পড়া হয় নি। মাত্র অল্প কয়েক দিন হল পড়তে আরম্ভ করেছেন। তিনি জ্যামিতিখানা নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে প্রতিজ্ঞা করলেন, যে পর্যন্ত না জ্যামিতি পড়া শেষ হবে, সে পর্যন্ত এখান থেকে উঠবেন না। আশ্চর্যের বিষয়, একদিন একরাত্রেই তাঁর জ্যামিতি পাঠ শেষ হয়ে গেল। এমনি ছিল তাঁর জেদ ও প্রতিভা!

প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে নরেন প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু দ্বিতীয় বর্ষে জেনারেল এসেমব্লি ইন্‌ষ্টিটিউশনে চলে আসেন।

কলেজে দর্শনশাস্ত্র পড়তে পড়তে নরেনের মনে প্রশ্ন জাগে, ভগবান আছেন কি নেই? যদি থাকেন তবে কে তাঁকে দেখেছে? যিনি দেখেছেন যেতে হবে তাঁর কাছে। যেখানে শুনেন কোন ধার্মিক লোক আছেন, তখনি তিনি সেখানে ছুটে গিয়ে তাঁকে আকুলভাবে জিগগেস করেন, —আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন?

কেউ বলেন, না, কেউ বলেন, হ্যাঁ। কেউ দেখেছি বললেই তাঁকে জিগগেস করেন, তবে আমায় দেখাতে পারেন?

কলকাতার নিকট গংগার তীরে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব থাকেন সেখানে। নরেনের ব্যকুলতা দেখে বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ পরামর্শ দিলে, তুমি একবার দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকট যাও।

নরেন হেসে উড়িয়ে দেন। বলেন, শেষটায় একটা পাগলের কাছে যাব ধর্মশিক্ষা করতে।

ঘটনাচক্রে নরেন যে পাড়ায় থাকতেন, সেপাড়ায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ একদিনবেড়াতেআসেন। ঠাকুরগানশুনতে ভাল-বাসেন, তাই মিত্তির মশাই নরেনকেধরেএনেছেন গান শোনাবার জন্যে।

গান যতক্ষণ হয় ঠাকুর নরেনের দিকে চেয়ে থাকেন। গান শেষ হলে নরেনের কাছে এগিয়ে তাঁর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে স্নেহে বললেন,—তুমি একদিন দক্ষিণেশ্বর যাবে ?

নরেন প্রথমে হ্যাঁ না কিছুই বললেন না। পরে একদিন যেতে রাজী হলেম।

কিছুদিন পরে নরেন তাঁর এক আত্মীয়ের সংগে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সংগে দেখা করতে যান। পরমহংসদেব নরেনকে দেখেই বহুদিনের পরিচিত ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার করতে লাগলেন।

তারপর থেকে নরেন দক্ষিণেশ্বরে প্রায়ই যাওয়া আসা করেন। বি-এ পাশ করার পর হঠাৎ তাঁর বাবা মারা যান।

পিতার মৃত্যুর পর নরেন দেখলেন বাবা যা কিছু উপার্জন করেছিলেন, তার সবই খরচ হয়ে গেছে। কাজেই অতি অল্প দিনের মধ্যেই সংসারে ঘোরতর দৈন্য দেখা দিলে।

দিনের পর দিন অর্ধাহারে, অনাহারে অথবা নামমাত্র খাদ্য গ্রহণ করে তিনি কলকাতার পথে ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলেন, কোথাও চাকরি পাওয়া যায় কিনা ? কিন্তু কোথাও একটা সামান্য চাকরি জুটল না। চোখের ওপর মা ভাই বোনদের কষ্ট তাঁর আর সহ্য হল না।

১৮৮৬ সালে ঠাকুরের দেহত্যাগের পর সবাই যে যার বাড়ি ফিরে গেল, কিন্তু ফিরলেন না বারজন যুবকশিষ্য, ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন যাঁরা।

বরানগরে একটি ভাঙা পোড়ো বাড়ি ভাড়া করা হল। সে বাড়িকে সকলে ভুতুড়ে বাড়ি বলত। এই ভুতুড়ে বাড়িতে গুরুভাইদের নিয়ে নরেন্দ্রনাথ কঠোর সাধনায় মগ্ন হলেন।

সেখানে কোনদিন তাঁদের একবেলা ভাত জোটে তো অন্য বেলা জোটে

না। আবার কোনদিন ভাত না জুটলে শুধু তেলাকুচোর পাতা সেদ্ধ খেয়েই আনন্দে দিন কাটিয়ে দিতেন। এত কষ্টের মধ্যেও তাঁরা হর হর, বম্ বম্ বলে আনন্দে দিনরাত মেতে থাকতেন। এই কঠোরতার মধ্যে সবার জীবনের লক্ষ্য ছিল, নিজেদের মানুষ গড়ে তুলে ভগবদ্‌ভাবে বিভোর হয়ে থাকা।

বরানগর মঠে নরেন্দ্রনাথ গুরুভাইদের নিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

নরেন্দ্রনাথ বরানগর মঠ থেকে তীর্থ পর্যটনে বের হন। কখনও গাছতলায়, কখনও মাঠে, কখনও পাহাড়ের গুহায় ভিক্ষামাত্র সম্বল করে সারা ভারত তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন, হিমালয় হতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত কোন স্থান বাদ দেন নি। ক্রমে ঘুরতে ঘুরতে মাদ্রাজে এসে উপস্থিত হন। সেখানে এসে আমেরিকার শিকাগো ধর্ম-সম্মেলনের কথা শুনতে পান।

সাত সমুদ্র তের নদীর পারে আমেরিকার শিকাগো শহর। পৃথিবীর সর্ব ধর্মের লোকদের নিয়ে চলেছে ধর্ম মহা সম্মেলন।

আমেরিকায় ভারতের শত্রুগণ প্রচার করেছিলেন হিন্দুধর্ম ধর্ম-ই নয়। হিন্দুজাতি অশিক্ষিত বর্বর, আরো কত কি। তখনকার দিনে ভারতবাসীরা বিদেশে না পেত আদর, না পেত সম্মান। হিন্দুধর্মের কোন প্রতিনিধিকে তাই এই এই বিশ্বধর্মসম্মেলনে নিমন্ত্রণ করা হয় নি।

ভারতের এই অসম্মানে নবীন সন্ন্যাসীর উদার অন্তর কাতর হল। মাদ্রাজের অনুরক্ত কয়েকজন যুবক ভক্ত তাঁকে আমেরিকায় গিয়ে ধর্ম মহাসভায় ভারতীয় ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রচার করতে অনুরোধ করেন। তারা সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। হিন্দু রাজা মহারাজারাও তাঁকে মুক্ত হস্তে সাহায্য করে ধন্য হলেন।

১৮৯৩ সালের ৩১শে মে স্বামী বিবেকানন্দ পেনিন্‌সুলার জাহাজে

আরোহণ করলেন। জাহাজ ছেড়ে দিলে। স্বামীজী ডেকের রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে ধীরে-ধীরে-মিলিয়ে-যাওয়া তীরভূমির দিকে চেয়ে রইলেন।

জাহাজ যথাসময়ে আমেরিকার তীরে নোঙর করলে। স্বামীজী আমেরিকার মাটিতে পা দিলেন।

বন্ধুহীন দেশে অচেনা অজানা পরাধীন ভারতবাসীকে কে দেবে স্থান ? কোন হোটেলেও তাঁর স্থান জুটল না। সারাদিন কিছু খাওয়া হয় নি। ঘুরতে ঘুরতে এসে এক রেল স্টেশনে কোন প্রকারে রাত কাটালেন।

পর দিন সকালে একটা পথ ধরে হাঁটিতে আরম্ভ করলেন। পথক্লান্তিতে ও ক্ষুধায় শরীর অবসন্ন হয়ে এল। পথের পাশে বসে বিশ্রাম করছেন এমন সময় সম্ভ্রান্ত ঘরের একজন মহিলার সংগে আলাপ হতে তিনি তাঁর বাড়িতে স্বামীজীকে নিয়ে যান।

সেই ধনী আশ্রয়দাতা মহিলার সাহায্যে ক্রমে তিনি শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে উপস্থিত হলেন। বহু অনুরোধের পর স্বামিজী সেই সভায় বক্তৃতা দেবার সুযোগ পান। যখন তিনি বক্তৃতা দিতে উঠলেন, তাঁর অপরিচিত পোষাক দেখে প্রথমে সকলেই বিস্মিত হয়ে গেল। 'আমেরিকাবাসী বোন ও ভাইরা' বলে সম্বোধন করতেই সকলে আনন্দে নেচে উঠল।

বক্তৃতা কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেষ করতে হল। বক্তৃতা শেষ হলে পরে আনন্দে অধির শ্রোতাদের করতালিতে সভাগৃহ তোলপাড় হতে লাগল।

আমেরিকার লোকেরা ধর্মালোচনা শুনেছে বহু, কিন্তু এমন মর্মস্পর্শী বাণী আর কখনও শোনে নি।

স্বামীজীর অমৃতময় বাণী তাঁদের অন্তর স্পর্শ করেছে।

ভারতবর্ষ আমেরিকার হৃদয় জয় করলে। আমেরিকার চোখে

আজ ভারতের নতুন মানচিত্র ফুটে উঠেছে। ভারতমাতার বীরসন্তান বিবেকানন্দের দ্বারা জগৎ সভায় ভারতের শ্রেষ্ঠ আসন স্থাপিত হল।

স্বামীজী ভারতবর্ষকে কত ভালবাসতেন। এখানে তার একটি ঘটনা উল্লেখ করব, তাতেই বুঝতে পারবে দেশের জন্য তাঁর প্রাণ কতটা ব্যাকুল হত।

শিকাগোর ধর্ম মহাসভা সবে মাত্র শেষ হয়েছে। কাগজে পথে ঘাটে সর্বত্র বিবেকানন্দের নাম। এক কোটিপতির বাড়ি থেকে তিনি নিমন্ত্রণ পেলেন। বিবেকানন্দকে সত্যিই তিনি খুব সমাদর ও যত্ন করলেন। বহু দামী দামী জিনিসে সাজানো অতি অপূর্ব ঘরে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হল। সেই ঘরের আলো, বিছানা এবং অন্যান্য সব জিনিসপত্র দেখে বিবেকানন্দ সত্যি খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন। ভারতের দুঃখ কষ্টের ছবি বার বার তাঁর মনে ভেসে উঠছিল। চোখের জলে তাঁর বালিশ ভিজে উঠল। বিছানা ছেড়ে তিনি উঠে পড়লেন ও খোলা জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। গভীর রাত্রে নিস্তব্ধ আলোর-মালা-পরা শিকাগো সহরকে এক স্বপ্নপুরী বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু ভারতের দুঃখ দুর্দশার ছবি তাঁর মনে আরও তীব্রভাবে জেগে উঠল। তিনি আর দাঁড়াতে পারলেন না, মেজেতে পড়ে ছট ফট করতে লাগলেন। ভারতের লোক দু বেলা দুমুঠো খেতে পায় না আর এদেশে টাকার ও ভোগবিলাসের ছড়াছড়ি। তিনি বলতে লাগলেন, আমার মা দুখিনী ভারত, তোমার এত দুর্দশা।

ভারতকে, ভারতবাসীকে অনেকেই গভীরভাবে ভালবেসেছেন। কিন্তু বিবেকানন্দের মত কয়জন ভালবেসেছিলেন বলতে পার?

আমেরিকায় দু বছর ধর্মপ্রচার করার পর স্বামীজী ইংলণ্ডে আসেন। ইংলণ্ডের ধর্মপ্রাণ নাগরিকগণও তাঁর খুব সমাদর করেন।

এখানেই স্বামীজীর সংগে মার্গারেট নোবলের পরিচয় হয়। এই নোবলই নিবেদিতা নামে পরিচিত। লণ্ডনে স্বামীজীর কাজে সাহায্য

করার জন্য তিনি স্বামী অভেদানন্দকে ডেকে পাঠালেন। স্বামী অভেদানন্দ লণ্ডনে এসে পৌঁছলে তাঁর হাতে ইউরোপ ও আমেরিকার কাজের ভার দিয়ে তিনি ভারতে ফিরে আসেন।

ভারতে ফিরে এসে গুরুভাইদের নিয়ে তিনি একটা সংঘ গড়ে তোলেন। সেই সংঘের নাম, রামকৃষ্ণ সংঘ। এই সংঘই পরে রামকৃষ্ণ মিশনে পরিণত হয়, আর বেলুড় মঠ হল তার প্রধান কেন্দ্র।

স্বামীজীর আহ্বানে সারা ভারতে একদল নতুন মানুষ জেগে উঠল, যাঁরা নরনারায়ণ সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে কৃতসংকল্প। সারা বিশ্ব আজ তরুণ সন্ন্যাসীর মহিমায় মুখর হয়ে উঠল। এইভাবে ভারতের প্রতি প্রদেশে এবং ভারতের বাইরে বহুদেশে রামকৃষ্ণ মিশন গড়ে উঠল।

ভারতের নরনারীকে স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ করে স্বামিজী যে বাণী প্রচার করে গেছেন, তাঁর একটি বাণী এখন তোমাদের শোনাচ্ছি,—তোমার মাতৃভূমি বীর সন্তান চাইছেন, তোমরা বীর হও। . ঈশ্বর তোমাদের আশীর্বাদ করুন।

মানুষের দুঃখে মর্মাহত হয়ে যে অগ্নি-বাণী তুমি ভারতবাসী তথা জগৎবাসীকে শুনিয়ে অমৃতলোকে প্রস্থান করেছ, তোমার সেই বাণী স্মরণ করে হে তরুণ তাপস, তোমায় জানাই আমাদের কোটি কোটি প্রণাম।

অন্যায় করো না, কিন্তু অন্যায় সহ্য করাও পাপ। —বিবেকানন্দ

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

বাংলার একটি ছোট গ্রাম সিকরা। চব্বিশ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমায় তার অবস্থান। গ্রামটি রেল স্টেশন থেকে বেশী দূরে নয়। চারদিক ধানজমিতে ভরা। গ্রামটি দেখতে ভারী সুন্দর। গ্রামের স্থানে স্থানে বড় বড় পুকুর। বট, অশ্বত্থ ও আম গাছের ডালে ডালে পাখিদের আনন্দ কলরব জেগে উঠেছে। ঘরের চালে চালে কাক ডেকে যাচ্ছে, কা কা।

গ্রামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ফুলে ফলে সুন্দর একখানি বাড়ি। বাড়িটি বেশ বড়। পথে যে কোন লোককে জিগগেস করলে বলে দেয়, এটি হল আনন্দমোহন ঘোষের বাড়ি।

আনন্দমোহন বাবু গ্রামের একজন নামকরা জমিদার। সে অঞ্চলের সবাই তাঁকে ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে।

আনন্দমোহন বাবুর স্ত্রী কৈলাসকামিনী দেবী রোজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুজো করেন আর প্রার্থনা করেন, বাবা, মনের মত একটি ছেলে দাও।

বার শ উনসত্তর সালে একদিন জমিদার বাড়িতে আনন্দের রোল উঠল। বাড়ির কর্তা আনন্দমোহনের একটি খোকা হয়েছে। প্রথম সন্তান। তাই মহা ধুমধামে উৎসব চলেছে। পাড়ার ছেলেরা মহাহুল্লটে নাচ গান করে আর আমোদ করে মুড়ি মুড়কি খায়।

কেষ্টঠাকুরের কাছে মানত করে ছেলেকে পেয়েছেন, মা আদর করে তাই নাম রাখলেন রাখাল।

খুব শান্ত শিষ্ট ছেলে রাখাল। ফুলের মত সুন্দর আর মাখনের মত নরম তাঁর শরীর। গ্রামের মেয়েরা কোলে নিয়ে তাঁকে আদর করে, ভাল ভাল খাবার এনে খাওয়ায়।

ছেলেবেলায় লোকে হাডু ডু, ফুটবল, হকি কত কি খেলে, কিন্তু রাখালের এ সব খেলা মোটেই ভাল লাগে না। তিনি টুকিপাটি, নাহন প্রভৃতি গ্রাম্য খেলাই বেশী পছন্দ করেন। তাঁর আর একটি মজার খেলা ছিল কালী পূজো।

রাখালদের বাড়ির পুকুর পাড়ে একটি কালীমন্দির ছিল, আর সেই মন্দিরের নিকটেই বোধনতলা। বোধনতলাটি ভারী ভাল লাগে তাঁর। নির্জন স্থান, মাঝে মাঝে দু একটি পাখির ডাক সে নির্জনতা ভংগ করে।

রাখাল খেলাধুলো নিয়ে পড়ে থাকে বোধনতলায়। মাটি দিয়ে কালী ঠাকুর তৈরী করে পূজারীর পোষাক পরে বসে পূজো করেন। আবার কখনও কখনও কলা বা কচুর ডাঁটা দিয়ে পাঁঠা তৈরী করে মা কালীর সামনে বলি দিতেন। এমনও দেখা গেছে বন্ধুদের মধ্যে কাউকে পূজোর আসনে বসিয়ে পূজো করতে বলে নিজেই জয় মা বলে পাঁঠা বলি দিতেন।

এ সব খেলা নিয়েই রাখাল মেতে থাকেন।

রাখাল ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলেন, ক্রমে পাঁচ বছর বয়সে পড়লেন। এই বয়সে ছেলেকে স্কুলে দেওয়া প্রয়োজন। গ্রামে কোন স্কুল বা পাঠশালা নেই যেখানে রাখালকে পড়তে দেওয়া যায়। বড়ই চিন্তায় পড়লেন তাঁর বাবা।

পরে আনন্দমোহন নিজেই গ্রামে একটি পাঠশালা খুললেন। পাঠশালার সমস্ত খরচ নিজে চালিয়ে নিয়ম করে দিলেন, এই স্কুলে সকলেই ফ্রি পড়তে পারবে। কাউকে বেতন দিতে হবে না। গ্রামে গরিব ছেলেদের লেখাপড়া শেখার সুযোগ হল।

রাখালকে সেই পাঠশালায় ভর্তি করিয়ে দেওয়া হল। রাখালের স্বভাব খুব শান্ত ও সরল, তা আগেই বলেছি। তিনি স্কুলে সকলের সংগে সরলভাবে মিশতে লাগলেন। তাঁর মধুর ব্যবহারে সকলেই তাঁকে খুব ভালবাসে। শিক্ষকমশাইরাও তাঁকে অন্তর দিয়ে স্নেহ করেন।

স্কুলে ভাল ছেলে থাকে, মন্দ ছেলেও থাকে, আর কতক ছেলে থাকে ভারী দুষ্টু। দুষ্টু ছেলেদের জ্বালায় মাস্টাররা অস্থির হয়ে পড়েন। তাদের জ্বালায় মাস্টারদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়, তাঁরা করেন তখন প্রহার।

রাখালদের ক্লাসে একদিন একটি ছেলে ভারী দুষ্টুমি আরম্ভ করলে। ছেলেটিকে ধমক দিয়ে, বুঝিয়ে, কত চেষ্টা করেও শিক্ষক তাকে কিছুতেই শান্ত করতে পারলেন না। তখন তাকে দিলেন কষে দু ঘা বেত। বেতের চোটে সে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদতে লাগল।

রাখালের মনটি ছিল অত্যন্ত কোমল। পরের দুঃখ তিনি মোটেই সইতে পারতেন না। ক্লাসের সেই ছেলেটি যখন কেঁদে উঠল, তখন তার সংগে তিনিও কেঁদে ওঠেন।

মাস্টাররা দেখলেন, মহা মুশকিল। এর জন্য তো আর কোন ছেলেকে বেতমারা যাবে না দেখছি।

তারপর থেকে সেই স্কুলে বেতমারা বন্ধ হয়ে যায়। রাখালের জন্যে সব ছেলেরা মাস্টারদের কঠোর শাসনের হাত থেকে বাঁচল।

রাখালের জ্যেঠা মশাই ছিলেন বদরাগী মানুষ। সামান্য কারণেই উঠতেন রেগে। জমিদার রাগী হলে প্রজারা থাকে ভয়ে ভয়ে।

জ্যেঠা মশাইয়ের মায়ের শ্রাদ্ধ।

ভারে ভারে দই ক্ষীর সব আসতে লাগল। সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। রাখাল ছোট হলেও ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগলেন।

রাখাল দেখলেন, দই ক্ষীর আসছে সব গরিব গয়লাদের বাড়ি থেকে। তারা জ্যেঠামশাইএর ভয়ে এ সব দিচ্ছে বটে, কিন্তু দিতে তাদের খুবই কষ্ট হচ্ছে। গয়লাদের দুঃখে ব্যথিত হয়ে রাখাল ছুটে গেলেন জ্যেঠামশাই-এর কাছে।

—জ্যেঠামশাই, এ আপনার মার শ্রাদ্ধ হচ্ছে, না গয়লাদের মার শ্রাদ্ধ

হচ্ছে? এভাবে গরিবদের মেরে কি আপনার মার আত্মার কল্যাণ করতে পারবেন? বলেই রাখাল তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন।

বড় ঘরের ছেলে হয়েও রাখালের প্রাণ কত উদার ছিল ও পরের দুঃখে কিরূপ কাতর হতেন, তা বুঝতে পাচ্ছ।

শুক্ল পক্ষের চাঁদের মত রাখাল ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলেন। গ্রামের পড়া শেষ হলে তাঁর বাবা কলকাতায় এনে তাঁকে ট্রেণিং একাডেমিতে ভর্তি করিয়ে দিলেন। পড়াশোনায় খুব সুনাম করতে না পারলেও কোনদিন কোন পরীক্ষায় তিনি ফেল করেন নি কিন্তু।

কলকাতায় এসে তাঁর বন্ধু বান্ধব জুটল বহু, কিন্তু এদের কারুর সংগে মিশে তিনি আনন্দ পান না। গ্রামের সেই কালীমন্দির আর বোধনতলায় তাঁর মন পড়ে থাকে। সহরের ছেলেদের চালচলন তাঁর মোটেই ভাল লাগে না। তাই কারুর সংগে না মিশে একা একা বসে থাকতেই তাঁর ভাল লাগে।

একাডেমি স্কুলের নিকটে একটা ক্লাব আছে। ক্লাবে অনেক ছেলে ব্যায়াম করতে আসে। রাখালের ব্যায়াম করতে খুব ভাল লাগে। পাড়ার ক্লাবের কথা শুনে তিনি সেই ক্লাবে ভর্তি হলেন এবং ব্যায়াম করতে আরম্ভ করলেন।

সিমলা পাড়া থেকে আর একদল ছেলে ব্যায়াম করতে সেই ক্লাবে আসত। নরেন্দ্রনাথ হলেন সেই দলের নেতা। রাখালের সংগে নরেনের অল্প দিনের মধ্যেই খুব ভাব হয়ে গেল। নরেন্দ্রনাথের কথা আগেই বলেছি।

হোগল কুঁড়ের অম্বুগুহ একটি কুস্তির আখড়া খুললেন। সেই আখড়ায় নরেন, রাখাল প্রভৃতি ছেলেরাও এসে জুটল। কুস্তি লড়া রাখালের একটা সখের খেলা। কুস্তিতে তিনি খুব ওস্তাদও ছিলেন।

নরেন ও রাখালের খুব ভাব জমে গেছে তা আগেই বলা হয়েছে। তাঁরা সবাই মিলে কত কি খেলেন। তাঁদের সখের খেলার মধ্যে আর একটি মজার খেলা ছিল ঘোড়ায় চড়া। তাঁরা যে ঘোড়াটি চড়তেন সেটা হল টাট্টু ঘোড়া। ঘোড়াটা সাদা, বর্মী ঘোড়া। তাঁরা ঘোড়াটির নাম দিয়েছিলেন, পেগু ঘোড়া।

নরেন, রাখাল, মহিম প্রভৃতি ছেলের দল স্কুল থেকে এসে বিকেলে ঘোড়ায় চড়তে যেতেন। আট দশজন ছেলে মিলে ঘোড়ার নাক, কান বা ঝোঁটন ধরে রাখত, যাতে সে নড়তে না পারে। তারপর নরেন ও রাখাল পালাক্রমে ঘোড়ায় চড়তেন।

ঘোড়ার পিঠে উঠে বসার পর সকলে মিলে ঘোড়াটাকে রথ টানার মত করে রাস্তায় ঘোরানো ফেরানো হত।

রাখাল যখন ঘোড়ায় চড়ে বসতেন তখন সকলে মিলে হাততালি দিয়ে হাসতেন, কারণ রাখাল বেঁটে ও মোটা, ঘোড়াটাও বেঁটে এবং মোটা সোটা। তাই দেখতে তাদের ভারী মজা লাগত। সেজন্য সকলে এই নিয়ে খুব হাসি তামাসা করতেন। এটি তাঁদের খুব আমোদের খেলা ছিল।

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে রামকৃষ্ণদেব থাকেন। রামকৃষ্ণের কথা আগেও কিছু বলেছি। তাঁর কাছে উপদেশ শোনার জন্য রোজই কত শত লোক যাতায়াত করে। মনোমোহন নামে রাখালের একজন আত্মীয় রামকৃষ্ণের কাছে আসতেন। মনোমোহন বাবুর সংগে রাখালও একদিন দক্ষিণেশ্বরে যান।

রামকৃষ্ণদেব রাখালকে দেখতে পেয়েই বহুদিনের পরিচিত ব্যক্তির মত আলাপ করতে থাকেন। তাঁর সরল ব্যবহারে রাখাল মুগ্ধ হলেন। রাখাল আর কোনদিন এরূপ ভাল ব্যবহার কারুর কাছে পান নি।

রামকৃষ্ণদেব রাখালকে বলতেন, ব্রজের রাখাল। ব্রজের রাখাল কাকে

বলে জান তো? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আর এক নাম ব্রজের রাখাল। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে রাখাল সেজে গরু চরাতেন। আর রাখাল ছেলেদের সংগে খেলা করতেন।

রামকৃষ্ণদেব রাখালের সংগে ছোট ছেলের মত খেলা করতেন। তিনি নিজে ঘোড়া হয়ে তাঁকে পিঠে নিয়ে ঘোড়া-ঘোড়া খেলতেন। তাঁদের খেলা দেখলে মনে হত যেন বাপ ছেলেকে নিয়ে আদরের খেলা খেলছেন। যশোদা যেরূপ কৃষ্ণকে গোপাল-গোপাল বলে ননী মাখন খাওয়াতেন, রামকৃষ্ণদেবও সেরূপ রাখালকে গোপাল-গোপাল বলে ডাকতেন আর ক্ষীর মাখন খাওয়াতেন।

রামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর রাখাল বৃন্দাবনে চলে যান। বৃন্দাবনে কতদিন নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়ান তারপর বরানগর মঠে গুরুভাইদের সংগে মিলিত হন।

বরানগর মঠে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁর সন্ন্যাস নাম হল স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ কঠোর তপস্বী ছিলেন। মথুরা, বৃন্দাবন, জ্বালামুখী প্রভৃতি স্থানে তিনি অনেকদিন তপস্যাতে দিন যাপন করেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে ফিরে এসে বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। একথা আগে আর একবার বলেছি। তিনি বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ নিজে না হয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে করেন।

বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ হবার পর স্বামী ব্রহ্মানন্দকে মঠের সকলেই রাজা মহারাজ বলে ডাকতেন।

পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ অনেকবার পুরী, ভুবনেশ্বর গিয়েছেন। ভুবনেশ্বর নির্জন ও শিবমন্দিরের জন্য বিখ্যাত। এটি একটি পীঠস্থানও বটে। এই জায়গাটি রাজা মহারাজের খুব ভাল লাগত।

বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ হবার পর দেখলেন নতুন সাধু ব্রহ্মচারীদের সাধন ভজন করার কোন নির্জন স্থান নেই। তাই তিনি ভুবনেশ্বরে একটি আশ্রম করবেন বলে মনে মনে ঠিক করলেন। কিছুদিন পর ভুবনেশ্বরে গিয়ে এক খণ্ড জমি সংগ্রহ করেন। সেই জমির ওপর তিনি একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন।

মঠটি ভারী সুন্দর। ফুল আর ফলের গাছে সাজানো গুছনো এক প্রকাণ্ড জমির ওপর তৈরী। বাঘ ভালুকের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে চারদিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা। তোমরা ভুবনেশ্বর বেড়াতে গেলে রাজা মহারাজের মঠটি দেখে এস।

কে কি করছে, কার কি হল, ওসব দেখবার বা ভাববার কিছুমাত্র দরকার নেই। তুমি নিজে ঠিক পথে এগিয়ে চল। লক্ষ্য ঠিক রেখে তোমার গন্তব্য পথে চলে যাও।

—ব্রহ্মানন্দ

স্বামী অভেদানন্দ

প্রায় ষাট বছর আগেকার কথা।

বরানগরে গংগার তীরে একটা পোড়ো বাড়ি। বাড়িটি দোতালা। ওপরের ঘরগুলো হুমড়ি খেয়ে যেন মাটির দিকে ঢলে পড়েছে। নিচের ভিজে অন্ধকার ঘরগুলোতে সাপ, গিরগিটি আর ইঁদুরের রাজত্ব। সকলেই একে বলে ভুতুড়ে বাড়ি। ভূতের ভয়ে দিনের বেলাতেও সেখানে যেতে কেউ সাহস করে না। এই ভুতুড়ে বাড়িতে একদল নবীন সন্ন্যাসী ডেরা বেঁধেছে। পরে এই ভুতুড়ে বাড়িকে লোকে বরানগর মঠ বলত।

গরমকাল।

দুপুরের রোদে বালি গরম হয়ে ঝাঁ ঝাঁ করছে। গরম বালির ওপর একজন তরুণ সন্ন্যাসী মরার মত চোখ বুঁজে পা ছড়িয়ে শুয়ে আছেন। তাঁকে এরকম অবস্থায় দেখে সকলেই মনে করে, তিনি মারা গেছেন। একজন ছুটে গিয়ে ভূতের বাড়ির সন্ন্যাসীদের খবর দিলে, তাদের একজন মরে শুকিয়ে রাস্তায় গরম বালির ওপর পড়ে আছেন।

সন্ন্যাসীরা ছুটে বাইরে এসে দেখেন তাঁদের গুরুভাই কালী শুয়ে ধ্যান করছে।

কালী ঐ রকম কঠোর তপস্যা করেন। কখনও কখনও মঠের একটা ঘরে সমস্ত দিন দরজা বন্ধ করে শাস্ত্রপাঠ ও গভীর ধ্যানে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। তাই তাঁর নাম হল কালীতপস্বী।

এই কালীতপস্বীই স্বামী অভেদানন্দ নামে পরে জগতে পরিচিত হন।

১৮৬৬ সালের কথা।

নিমু গোস্বামী লেনে রসিকলাল চন্দ্রের বাড়ি।

রসিকলালের স্ত্রী নয়নতারা দেবী প্রত্যহ মা কালীর পূজো করে প্রার্থনা করেন,—মা, ছেলের মত যদি ছেলে দাও, তবে বুক চিরে রক্ত দিয়ে তোমার পূজো করব।

মা কালী মায়ের কাতর প্রার্থনা শুনলেন।

১৭ আশ্বিন, রাত ৯টায় রসিকলালের বাড়িতে শাঁক বেজে উঠল। পাড়ার মেয়েরা দলে দলে দেখতে এল নয়নতারার খোকাকে।

সকলে অবাক, কই ছেলে তো কাঁদে না। হাত পা সব নাড়ি দিয়ে জড়ানো, চোখ বন্ধ। ধাই মা বলে, এ সাধারণ ছেলে নয়। এ নিশ্চয় কোন যোগী মহাপুরুষ। ভগবান একে কি জানি কেন পাঠিয়েছেন? এখনও সে শিশু ধ্যান করছে, তাই তার চোখ বন্ধ।

তারপর ছেলের চোখে লংকার গুঁড়ো দিয়ে কাঁদিয়ে চোখ খোলা হল। মা কালীর মানত করে ছেলেকে পেয়েছেন বলে মা তাঁর নাম রাখলেন কালীপ্রসাদ।

পাঁচ বছর বয়সে কালীপ্রসাদকে হাতে খড়ি দিয়ে লাহাপাড়ার গোবিন্দ শীলের পাঠশালায় ভর্তি করিয়ে দেওয়া হল। এই স্কুল ছেড়ে দু বছর পরে কালীপ্রসাদ আহিরীটোলার যদু পণ্ডিতের বংগ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং দশ বছর বয়সে সেখান থেকে বিখ্যাত স্কুল ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে প্রবেশ করেন।

কালীপ্রসাদ অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি সব পরীক্ষাতেই প্রথম হতেন। কখনও কখনও ডবল প্রমোশনও পেয়েছেন। শান্ত-স্বভাব ও মধুর ব্যবহারের দ্বারা তিনি সকলের হৃদয় জয় করেছিলেন। শিক্ষকগণ তাঁকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করতেন আর সহপাঠী বন্ধুরা তাঁকে অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন।

সংস্কৃত পড়তে কালীপ্রসাদের খুব ভাল লাগত। স্কুলে যা সংস্কৃত পড়ানো

হত, তা ছাড়া তিনি অবসর মত হাতিবাগানে একটা টোলে সংস্কৃত পড়তে যেতেন। দেখতে দেখতে অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি রঘুবংশ, কুমার-সম্ভব এবং মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের মত কঠিন সংস্কৃত ব্যাকরণ মুখস্থ করে ফেললেন।

পরে ছন্দোমঞ্জরী প্রভৃতি সংস্কৃতছন্দের বই পড়তে পড়তে নিজেই শ্লোক রচনা করতে আরম্ভ করেন। এত অল্প বয়সে তাঁর অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় পেয়ে শিক্ষকমশাই অবাক হয়ে যান।

ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে কালীপ্রসাদ ড্রইং ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। প্রাকৃতিক দৃশ্য হতে ছবি আঁকার অভ্যাস করতে হত। ছবি আঁকাতে তাঁর অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পেয়ে শিক্ষক মশাই তাঁকে যত্ন করে ছবি আঁকা শেখাতে লাগলেন।

একদিন হঠাৎ কালীপ্রসাদের মনে হল, আমি চিত্রকর হতে চাই না, আমি চাই দার্শনিক হতে। একথা মনে আসতেই তিনি ছবির ক্লাসে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন।

ছবির মাস্টার তাঁকে জিগগেস করলেন, তুমি কেন ছবির ক্লাসে আস না?

তিনি বললেন, আমি দার্শনিক হতে চাই। তাই ভাবছি ছবি আঁকা শিখে কি হবে?

—একজন চিত্রকর একজন দার্শনিকের চেয়ে অনেক বড়। বড় হতে হলে তোমার এই চিত্রবিদ্যা শেখা দরকার। তুমি চেষ্টা করলে ভবিষ্যতে বড় চিত্রকর হতে পারবে।

—কিন্তু চিত্রকর কেবল বাইরের জিনিসের ছবিই আঁকতে পারে। ভেতরের বিষয় সে কিছুই জানে না। সে 'কি' ও 'কেন'-র জবাব দিতে পারে না। কিন্তু দার্শনিক তা পারে, সে বস্তুর মূল কারণ জানে।

—তা হলে তোমাকে চিত্রকরও হতে হবে আবার দার্শনিকও হতে হবে।

—তা হতে পারে না। একজন লোক দুজন প্রভুর সেবা করে দুজনকেই সন্তুষ্ট করতে পারে না।

ছাত্রের এই উত্তর শুনে শিক্ষক স্তম্ভিত হলেন কিন্তু চুপ করে থাকলেন আর মনে মনে আশীর্বাদ করলেন।

১৮৮৩ সালের একদিন।

বিখ্যাত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মশাই আজ এলবার্ট হলে যোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা করবেন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সেই সভার সভাপতি। এলবার্ট হলে আজ লোক ধরে না। কালীপ্রসাদ ভীড়ের মধ্যে একটু জায়গা করে নিলেন।

পণ্ডিত চূড়ামণি মশাইএর যোগের সরল ব্যাখ্যা শুনে কালীপ্রসাদের যোগ শেখবার প্রবল বাসনা হল। যোগ শিখতে হলে চাই গুরু। যোগ সাধনা শিক্ষা যিনি দেবেন, তিনি ভগবানকে দর্শন করেছেন এমন লোক হওয়া চাই। এমন লোক জগতে বিরল। গুরুর সন্ধানে কালীপ্রসাদ অস্থির হয়ে উঠলেন। সহপাঠী বন্ধু যজ্ঞেশ্বরের মুখে তিনি শুনলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কথা।

একদিন রবিবার পায়ে হেঁটে কালীপ্রসাদ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংগে দেখা হল। কিছুদিন কথাবার্তার পর তিনি ঠাকুরকে তাঁর যোগ সাধনা শিক্ষা করার ইচ্ছা জানালেন।

—তুই তো পূর্বজন্মে যোগী ছিলি। সিদ্ধিলাভের অল্প বাকী ছিল। এই তোর শেষ জন্ম। আয়, তোকে যোগ সাধনের উপায় শিখিয়ে দিই। বলেই তিনি ভবতারিণীর মন্দিরের বারান্দায় নিয়ে যোগাসনে বসিয়ে তাঁর

জিহ্বায় নিজের আঙুল দিয়ে মূলমন্ত্র লিখে দিলেন এবং কালীর বুকে নিজের হাত রাখলেন। সংগে সংগে কালীপ্রসাদ বাইরের জগতের জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। শরীর কাঠের মত অসাড় ও নিশ্চল হয়ে রইল। যোগীদের এই অবস্থার নাম সমাধি।

অজ্ঞান হলে লোকের অবস্থা যেমন হয়, সমাধি হলে বাইরে থেকে সেই রকম মনে হয়। কিন্তু ভেতরে থাকে পূর্ণ জ্ঞান। সমাধির পর মানুষের মনের অবস্থা অনেক উঁচু হয়ে যায়।

এইভাবে সমাধিমগ্ন হয়ে কিছুক্ষণ থাকার পর ঠাকুর পুনরায় কালীপ্রসাদের বুক স্পর্শ করামাত্র তিনি সমাধি হতে ফিরে এলেন।

কালীপ্রসাদের দীক্ষা হল। মনের মত গুরু তিনি পেলেন।

দীক্ষা গ্রহণের পর থেকে কালীপ্রসাদ সময় পেলেই দক্ষিণেশ্বরে যান। ঠাকুরের নির্দেশে তিনি ধ্যান অভ্যাস করে আধ্যাত্মিক পথে দিন দিনই এগিয়ে যেতে লাগলেন। ক্রমে ধ্যানে তিনি শিব, দুর্গা, কালী ও কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তি দর্শন করতে থাকেন। একদিন দেখলেন, সমস্ত দেবদেবী তাঁর গুরুর শরীরের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল। তিনি ঠাকুরকেও এ বিষয় জানালেন। ঠাকুর বললেন, যা, তোর বৈকুণ্ঠ দর্শন হয়ে গেল।

কালীপ্রসাদ ঠাকুরের নিকট আসার আগে থেকেই নরেন (বিবেকানন্দ), রাখাল (ব্রহ্মানন্দ) প্রভৃতি ত্যাগী ভক্তেরা ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন। তাঁদের সকলের সঙ্গে কালীপ্রসাদের পরিচয় হল।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর অসুস্থ হয়ে কাশীপুর বাগান-বাড়িতে বাস করতে থাকেন। এই সময় ত্যাগী শিষ্যরা মনেপ্রাণে ঠাকুরের সেবা করতেন। কালীপ্রসাদ সে সময় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে ঠাকুরের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিলেন।

কাশীপুর বাগানে দুটো পুকুর ছিল। তাতে নরেন ও কালী ছিপ দিয়ে মাছ ধরতেন। দু জনের মাছ ধরা নিয়ে প্রতিযোগিতা হত। এই প্রতিযোগিতার ফলে এক-একদিন তাঁরা অনেক মাছ ধরতেন। এ সব কথা ক্রমে ঠাকুরের কানে গেল। ঠাকুর একদিন কালীপ্রসাদকে ডেকে বলেন, হ্যাঁ রে, তুই নাকি খুব মাছ ধরিস ? জানিস জীবহিংসা মহাপাপ।

উত্তরে কালী বলেন, গীতায় আছে, আত্মা মরে না এবং কাউকে মারেও না, তা হলে মাছধরা মহাপাপ হবে কেন ?

ঠাকুর নানা যুক্তি দিয়ে তাঁকে বুঝাতে লাগলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই বুঝবেন না।

তখন ঠাকুর আবার বলেন, তোকে ছেলেদের মধ্যে বুদ্ধিমান বলে জানি। নরেনের নিচেই তোর বুদ্ধি। আমি যা বললুম তুই তা ধ্যান করে বুঝতে চেষ্টা কর, ঠিক বুঝতে পারবি।

ঠাকুরের আদেশমত কালীপ্রসাদ ধ্যান করার পর বুঝতে পারলেন মাছ ধরা কত অন্যায়! তিনি ঠাকুরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেন, আর কখনও আমি মাছ ধরব না।

তখন ঠাকুর বলেন, ত্বাখ, ছিপ দিয়ে মাছ ধরাতে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। খাবারের লোভ দেখিয়ে বড়সি লুকিয়ে রাখা আর অতিথি বা বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে তার খাবারের মধ্যে বিষ লুকিয়ে রাখা একই পাপ।

ঠাকুরের অসুখ বেড়েই চলে। বিদায়ের দিন এগিয়ে আসে। সে কথা জানেন শুধু অস্তাচল-পথযাত্রী মহামানব।

একদিন ঠাকুর শিষ্যদের সকলকে ডেকে ভিক্ষে করে আনতে আদেশ করলেন। ভিক্ষান্ন বড় পবিত্র। সেই চালে আজ খাওয়া হবে।

তরুণ তপস্বীর দল ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষায় বেরিয়ে যায়। ভিক্ষে করে ফিরে এসে মহা উল্লাসে সেই ভিক্ষের চাল রান্না করে।

ঠাকুর প্রথমে গ্রহণ করে প্রসাদ করে দেন, মহানন্দে সবাই পরে তা গ্রহণ করেন।

আমি বড়, মনে এই অভিমান থাকলে কখনও ধর্ম হয় না। নতুন শিষ্যেরা সবাই ছিলেন শিক্ষিত ও সম্মানিত পরিবারের ছেলে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভিক্ষে করতে গেলে তাঁদের অভিমানে ঘা লাগবে। ঠাকুর এভাবে তাঁদের অভিমান ভেঙে দিয়েছিলেন।

দিন শেষ হয়ে আসে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসমাধিতে মগ্ন হলেন। ঠাকুরের নবীন শিষ্যরা হারালেন স্নেহশীল গুরু ও বন্ধু। গুরুর স্মৃতি ও আদর্শ তাঁদের বুকে আগুন জ্বালিয়ে সমস্ত বাসনা পুড়িয়ে দিলে। ঘরের ডাকে ফেরাতে পারলে না তাঁদের। গুরুর দেওয়া ত্যাগের প্রতীক গৈরিক তাঁদের মনকে তীব্র বৈরাগ্যে অনুরঞ্জিত করে কঠোর তপস্যার পথে এগিয়ে নিয়ে গেল। নরেন প্রভৃতি ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যেরা ঠিক করলেন আর ঘরে ফিরে যাবেন না। বিশ্বের পথে এসে দাঁড়ালেন তরুণ তাপসের দল।

বরানগরের এক বাড়ীতে মঠ প্রতিষ্ঠা করে নরেন, কালী প্রভৃতি গভীর সাধনায় মগ্ন হলেন।

একদিন নরেন গুরুভাইদের নিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন।

সন্ন্যাস যেন নতুন জন্ম! তাই সন্ন্যাসের সময় আগের নাম বদলে নতুন নাম হয়। তরুণ সন্ন্যাসীদের আগের নাম সব পালটে গেল। যাঁর যে-রকম মনের ভাব, তাঁর সেই রকম নাম হল। কালীর কাছে এ জগতে সকল বস্তুই এক, কোন ভেদ নেই। তাই তাঁর নাম হল অভেদানন্দ।

বরানগর মঠে স্বামী অভেদানন্দ দিনরাত জপ ধ্যান করতেন। সংস্কৃত ভাষাটা তিনি খুব ভাল করে শিখেছিলেন, সে কথা আগেই বলেছি। এ সময় তিনি ঠাকুর ও মায়ের একটা স্তোত্র রচনা করেন। মায়ের নামে

প্রথম স্তবটি রচনা করে শ্রীমাকে সেটা পড়ে শুনালে তিনি খুব খুশী হয়ে আশীর্বাদ করে বলেন, তোমার মুখে সরস্বতী বসুন।

বল বাহুল্য, তারপর থেকে তিনি বাক্‌সিদ্ধ হন।

আমরা যখন যা বলি, সব সময় তা ঠিক হয় না। যাঁরা ভগবানের আরাধনা করেন তাঁদের কারুর কারুর এমন একটা অবস্থা আসে, তাঁদের মুখ দিয়ে যে সব কথা বের হয়, তা সত্যি সত্যি ফলে যায়। একেই বলে বাক্‌সিদ্ধ। বাক্যে যিনি সিদ্ধ হয়েছেন তিনিই বাক্‌সিদ্ধ।

স্বামী অভেদানন্দ যখন যা বলতেন, তা ঠিক ঠিক ফলে যেত। এখানে দুটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

একবার একজন লোক দার্জিলিঙে বেড়াতে আসেন। তিনি খুব ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন। দার্জিলিঙে তাঁর পিঠে একটা কার্বাংকল হয়। ডাক্তাররা বললেন, অপারেশন করতে হবে। অপারেশনে নিশ্চয়ই মরে যাবেন এই ভেবে ভদ্রলোকটি স্বামীজীকে একবার দেখবার জন্য ব্যাকুল হন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলেন, স্বামীজী, কাল আমার অপারেশন। আমি তো আর বাঁচব না। আপনার পায়ের ধুলো দিন, আপনার আশীর্বাদ নিয়ে শেষ বারের মত শান্তিতে চোখ বুঁজি।

স্বামীজী বললেন, কোন ভয় নেই, ঠাকুরের নাম কর। ঘা আপনা থেকেই সেরে যাবে।

সেই রাত্রেই ঘার মুখ ফেটে পুঁজ বের হতে লাগল। সকলেই আশ্চর্যান্বিত হলেন।

পরের দিন সকালে ডাক্তার অপারেশন করতে এসে অবাক হয়ে যান এবং জিগগেস করেন, ঘায়ের মুখ কি করে ফাটল ?

দেখতে দেখতে রোগী সুস্থ হয়ে উঠলেন।

আর একটি ঘটনা।

প্রহ্লাদবাবু নামে এক ভদ্রলোক একবার স্বামীজীকে দর্শন করতে এলেন। সংগে এল তাঁর দু বছরের ছেলে। স্বামীজী ছেলের নাম জিগগেস করলে সে চুপ করে থাকে। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে স্বামীজী বললেন, কিরে তুই কথা বলছিস না যে? তুই বোবা নাকি?

ছেলেটিকে নিয়ে প্রহ্লাদবাবু ঘরে ফিরে গেলেন। ছেলেটি আর কথা বলতে পারে না। বোবার মত হাত নেড়ে মনের ভাব ব্যক্ত করে। প্রহ্লাদবাবু আর তাঁর বুড়ো মা ভাবলেন ছেলের গলায় কিছু হয়েছে। তাঁরা চিন্তিত হলেন। হঠাৎ তাঁদের মনে পড়ে গেল স্বামীজীর কথা। তাঁরা মনে করলেন, তিনি বাক্‌সিদ্ধ, তাই তাঁর কথা ফলেছে।

তখন ছেলেকে নিয়ে প্রহ্লাদবাবু স্বামীজীর কাছে আবার এলেন। স্বামীজী বললেন, আমি তো ওকে খারাপ কিছু বলি নি।

তারপর তিনি ছেলের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বলেন, যা, তুই ভাল হয়ে গেলি।

দেখতে দেখতে ছেলে আবার কথা বলার শক্তি ফিরে পেলে।

স্বামী অভেদানন্দ বরানগর মঠ থেকে পায়ে হেঁটে ভারত ভ্রমণে বের হলেন। নবীন পরিব্রাজক চলেছেন ভারতের তীর্থ পর্যটনে। শরীরের আবরণ একটি মাত্র গৈরিক বসন। হাতে ভিক্ষাপাত্র কমণ্ডলু। পরিব্রাজক অভেদানন্দ প্রতিজ্ঞা করলেন—টাকা-পয়সা ছুঁবেন না, নিজে রান্না করবেন না, আর পাদুকা গ্রহণ করবেন না। দুপুরের আহার হবে, তিন বা পাঁচটি ঘর থেকে পাওয়া ভিক্ষায়। গাছতলা হবে রাত্রির আশ্রয়। এইভাবে প্রত্যহ তিনি ২৫।৩০ মাইল চলতে লাগলেন। হাঁটতে হাঁটতে এসে পুরীতে উপস্থিত হলেন।

বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম কেন্দ্র এই পুরীধাম। বৈষ্ণব সাধকেরা যে সকল গুহায় তপস্যা করতেন তারই একটিতে পরিব্রাজক অভেদানন্দ আশ্রয়স্থান করে নিয়ে সাধনায় নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন। কিছুকাল সাধনার পর তিনি ভুবনেশ্বরের অভিমুখে যাত্রা করলেন।

ভুবনেশ্বর থেকে চললেন উদয়গিরি ও খণ্ডগিরিতে। এখানে অতীত ভারতের কত স্মৃতি, কত মহিমা, কত সাধকের চিহ্ন বর্তমান রয়েছে! তিনি দেখলেন বৌদ্ধদের মঠ, ভিক্ষুদের সংঘ।

তারপর তিনি পশ্চিম ভারতের গাজীপুর, কাশী, অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ ভ্রমণ করেন। লক্ষ্ণৌ থেকে হৃষীকেশ হয়ে উত্তরকাশী ও দেবপ্রয়াগ প্রভৃতি স্থান ঘুরে ক্রমে বদরিকাশ্রম পৌঁছলেন। এইভাবে তিনি ভারতের সমস্ত তীর্থস্থান ঘুরে বেড়ান এবং হিমালয়ের নির্জন গুহায় কিছুদিন কঠোর তপস্যা করেন।

লেখাপড়া শিখতে বা গান-বাজনা শিখতে হলে কি রকম পরিশ্রম করতে হয় তা তোমরা জান। খুব ছেলেবেলা থেকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, তবে শেখা যায়। এই কঠোর পরিশ্রমের নামই হল সাধনা।

যাঁরা ভগবানকে দর্শন করার জন্য ব্যাকুল হন, তাঁরাও ঠিক সেরূপ আরাধনা করে দিনের পর দিন কঠোর সাধনা করেন। সাধকেরা এই যে খুব কষ্ট করে সাধনা করেন, তারই নাম তপস্যা।

তপস্যায় দেহমন শুদ্ধ হয়। দেহমন শুদ্ধ হলে ভগবানের দর্শন পাওয়া যায় ও জ্ঞান লাভ হয়।

১৮৯৩ সাল ভারতের একটি স্মরণীয় বছর। এ বছরে স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্ম-মহাসম্মেলনে ভারতের বাণী আমেরিকায় প্রচার করে ভারতের মান বাড়িয়েছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় প্রচারের কাজ শেষ করে লণ্ডনে যান। লণ্ডনে তাঁর কাজে সাহায্যের জন্য তিনি স্বামী অভেদানন্দকে ডেকে পাঠান।

স্বামী অভেদানন্দ লণ্ডনে গেলেন। লণ্ডনে ক্রমে তিনিও ভারতের ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে থাকেন। তাঁর বক্তৃতা শুনে বিবেকানন্দ ও সেখানকার লোকেরা খুব খুশী হলেন।

লণ্ডনের একটি ঘটনা।

স্বামী অভেদানন্দ স্টার নামে একজন সম্ভ্রান্ত মহিলার বাড়িতে অতিথি হয়েছেন। অষ্ট্রেলিয়ার একজন নামকরা পাদরীও স্টারের অতিথি হলেন। একই টেবিলে তাঁরা খেতে বসেন।

স্বামী অভেদানন্দকে নিরামিষ খেতে দেখে সেই পাদরী সায়েব চটে লাল হয়ে যান। পাদরী স্বামীজীকে নিরামিষ খাওয়ার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, জীবহিংসা করলে পাপ হয়। সেজন্য তিনি মাছ-মাংস খান না।

পাদরী সাহেব রেগে বলে ওঠেন, এ শয়তানের ধর্ম। যে বিশ্বাস করে, সেও শয়তানের উপাসক। তোমরা কেউ ওর কথা শোন না।

স্টার তাঁকে বাধা দিয়ে বলেন, আমার বাড়িতে এ সব ঝগড়া চলবে না।

যা হোক শ্রীমতী স্টারের ধমক খেয়ে পাদরী চুপ করে গেলেন।

পাদরী সাহেব চলে গেলে পর স্বামীজী স্টারকে জিগগেস করে জানতে পারেন বাইবেলে আছে যারা নিরামিষ খায় এবং অপরকেও মাছ-মাংস খেতে বারণ করে, তারা ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে শয়তানের মত প্রচার করে। স্টার বলেন, এ দেশে গোঁড়া খৃস্টান পাদরীরা ঐ সব কথা বিশ্বাস করে এবং কাউকে নিরামিষ খেতে দেখলেই তাঁরা তার সংগে ঝগড়া করে।

লণ্ডনে এক বছর প্রচারের কাজ চালাবার পর স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকায় চলে আসেন।

আমেরিকায় তিনি অনেক দিন ছিলেন। সেখানে তাঁর অনেক

বড় বড় বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সমাজসংস্কারক ও ধর্ম-প্রচারকের সংগে আলাপ-পরিচয় হয়। জগৎবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিসনের সংগেও সে সময় তাঁর আলাপ হয়।

স্বামীজীর সংগে নানা বিষয়ে আলোচনা করে এডিসন তাঁর গভীর দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানে মুগ্ধ হন ও বিশেষ বন্ধুরূপে তাঁকে গ্রহণ করেন। স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ তাঁর আবিষ্কৃত একটি গ্রামোফোন নিজের হাতে তৈরী করে স্বামীজীকে উপহার দেন। এই গ্রামোফোনটি এখনও দার্জিলিঙ আশ্রমে আছে।

ব্রিটিশ শাসনের আমলে ভারতে রেলগাড়ি, জাহাজ, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, স্কুল, কলেজ আরো কত কি হয়েছে! অজ্ঞ ভারতবাসীরা লেখাপড়া শিখে বিদেশে সম্মান লাভ করেছে। এ সব কথা ব্রিটিশরা ভারতের বাইরে প্রচার করত। ভারতের বাইরে কেন? ভারতের মধ্যেও এ সব কথা তারা প্রচার করেছে শতাব্দী ধরে। এ সব কথা এক সময় ভারতবাসীরাও বিশ্বাস করত। শুধু তাই নয় অনেক ভারতবাসী বিদেশে গিয়েও ঐ সব কথা বলে এসেছে। তার ফলে বিদেশীরা মনে করত ভারতবাসীরা অসভ্য, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা বলতে কিছু নেই। ব্রিটিশরাই তাদের শিক্ষিত করে তুলেছে এবং তাদের দেশের উন্নতি করে আসছে।

তখনকার দিনে রেলগাড়ি, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি ব্রিটিশরা ভারতে কেন করেছিল? তাদের নিজেদের সুবিধের জন্যে। রাজত্ব চালাবার পথ সহজ করার জন্যই করেছিল। ভারতকে যাতে বেশী দিন তাদের অধীনে রাখা সম্ভব হয় ও অল্প পরিশ্রমে বেশী করে শোষণ করা যায়, তারই জন্যে তারা এ সব ব্যবস্থা করেছে। তোমরা আজকাল এ বিষয়ে বেশ বুঝতে পার। তখনকার দিনে লোকে এ সব বুঝত না। যারা বুঝত, তারাও সাহস করে মুখ ফুটে তা বলতে পারত না। এ সব কথা বিদেশে স্বামী অভেদানন্দ

খুব জোর দিয়ে বলেছিলেন। তার আগে আর কোন ভারতবাসী ভারতের পক্ষে এভাবে বিদেশে প্রচার করে নি।

স্বামীজী ভারতের কথা আমেরিকাবাসীদের কাছে ঘোষণা করে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অনেক সাহায্য করেছিলেন।

ইণ্ডিয়া অ্যা'ণ্ড্ হার পিপল নামে স্বামীজীর একখানা বই আছে। ঐ বই-এ ভারতের সংস্কৃতি সম্বন্ধে ও ভারতে ব্রিটিশের অত্যাচারের অনেক কাহিনীই আছে। ভারত-সরকার এই বইটিকে ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিলেন।

পঁচিশ বৎসর ধরে ইউরোপ ও আমেরিকায় ভারতের বাণী প্রচার করে ১৯২১ সালে তিনি মাতৃভূমির দিকে রওনা হলেন। পথে তিনি হনলুলু, জাপান, চীন, ফিলিপাইন, সিঙাপুর, কুয়ালালামপুর ও রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন এবং ভারতের সম্বন্ধে সে-সব স্থানে বক্তৃতাদি করেন। রেঙ্গুন থেকে জাহাজে করে তিনি কলকাতায় এসে পৌছলেন।

বহুদিন পরে ভারতমাতার প্রিয় সন্তান মার কোলে ফিরে এলেন। মায়ের গৌরব ও মহিমা বুকে নিয়ে দেশে দেশে তার শ্রেষ্ঠ আসন স্থাপন করে এলেন। আজ বড় শ্রান্ত, বড় ক্লান্ত। ভারতবাসী এই বীর কর্মী, জ্ঞানী ত্যাগীকে উপযুক্ত সম্মান দেখিয়ে নিজেদের ধন্য করার জন্যে ব্যস্ত হলেন। কলকাতার রাস্তাগুলি স্বামীজীর জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল।

১৯২২ সালে স্বামী অভেদানন্দ কাশ্মীরে যান ও মহারাজার অতিথি হন। কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর থেকে পায়ে হেঁটে ১১০০০ হাজার ফুট হিমালয়ের উপর দিয়ে তিনি তিব্বতের রাজধানী লাসায় গিয়ে পৌছলেন।

স্বামীজীর বয়স তখন ৫৫ বৎসর। এই বৃদ্ধ বয়সে বরফের ওপর দিয়ে এতটা পথ হেঁটে যাওয়া খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার।

লাসা থেকে বৌদ্ধদের বিখ্যাত মন্দির হেমিসমঠ দর্শন করেন। তিব্বত

থেকে ফেরার পথে রাওয়ালপিণ্ডি এবং কাবুল নদীর পারাপারে আফগানিস্থানের সীমানা পর্যন্ত খাইবার গিরিপাশ দিয়ে ভ্রমণ করে তিনি কলকাতায় ফিরে এসে বেলুড় মঠে অবস্থান করেন।

কলকাতা থেকে একদল ছাত্র স্বামীজীর সংগে দেখা করতে বেলুড় মঠে আসে। কলকাতায় একটি আশ্রম করার জন্য স্বামীজীকে তারা বিশেষ অনুরোধ জানায়। তিনি তাদের অনুরোধে কলকাতায় রামকৃষ্ণ বেদান্ত-সমিতি স্থাপন করেন। তার এক বছর পরে তিনি দার্জিলিঙে রামকৃষ্ণ বেদান্ত-আশ্রম স্থাপন করেন।

নেতাজী সুভাষ সে বছর ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। ভারতের সর্বত্র রাষ্ট্রপতি সুভাষের জয়। সারা পৃথিবীর চোখ পড়েছে ভারতের ওপর—ভারতের রাষ্ট্রপতি সুভাষের ওপর।

সে সময়ে হঠাৎ একদিন সুভাষচন্দ্র কলকাতার রামকৃষ্ণ বেদান্ত-মঠে স্বামী অভেদানন্দের ঘরে এসে দাঁড়ালেন। স্বামীজীকে প্রণাম করতেই তিনি সুভাষচন্দ্রকে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, সুভাষ, তুমি বিজয়ী বীর হও!

স্বামীজীর এই আশীর্বাণী সুভাষচন্দ্রের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হয়ে ফুটে উঠেছে। কত বিপদ, কত ঝড়-ঝাপটা যে তাঁর জীবনের ওপর দিয়ে গেছে, তার শেষ নেই। তবু জগতের ইতিহাসে ও ভারতের ছোট বড় সকলের হৃদয়ে নেতাজী সুভাষ বিজয়ী বীর।

জগতের সকল বস্তুই এক, কোন ভেদ নেই। এই হল ধর্মসমন্বয়ের মূল কথা। মানুষের সংগে ভগবানের মিলন, মানুষের সংগে মানুষের মিলন,—এইভাবে অভেদজ্ঞানের মূল কথাটি স্বামী অভেদানন্দ জগৎকে জানিয়ে দিয়ে গেছেন। তাঁর অমৃতবাণী আজও জগদ্‌বাসীর অন্তরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

স্বামী শিবানন্দ

কলকাতা থেকে রেলপথে বারাসত সাত ক্রোশের রাস্তা। বারাসত বাংলার একটি ছোট শহর।

বারাসত শহরে অনেক লোক বাস করে। তার মধ্যে কয়েক ঘর সম্ভ্রান্ত লোকেরও বসতি আছে। সে সময় কানাইলাল ঘোষাল নামে একজন সম্ভ্রান্ত লোক বারাসতে ছিলেন।

সে অঞ্চলে কানাইলালের খুব নাম। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বলে সকলেই তাঁকে জানত ও শ্রদ্ধা করত। তিনি রোজ কালীপূজা করতেন। পূজা অর্চনা, চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ না করে কোন দিন তিনি জলগ্রহণ করতেন না।

দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতেও কানাইবাবু মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতেন এবং ভক্তি করে মায়ের পূজো করতেন। সেখানে রামকৃষ্ণের সংগে তাঁর দেখা হয়। রামকৃষ্ণকে তিনি খুব ভক্তি করতেন। তাঁর উপদেশ কানাইবাবুর বেশ ভাল লাগত।

কানাইবাবু উকিল ছিলেন। ওকালতি করে তাঁর যা পয়সা হত তাতে তাঁর সংসার চলত। তাঁর আর একটা গুণ ছিল, তিনি কবচ দিয়ে লোকের অনেক রোগ ভাল করে দিতে পারতেন।

একবার রামকৃষ্ণদেবের শরীরে খুব জ্বালা হয়েছিল। শরীরের জ্বালায় তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। অনেক ডাক্তারী কবিরাজী চিকিৎসা করেও রোগের উপশম হয় নি। শোনা যায়, কানাইবাবু একটি কবচ দিয়ে তাঁর রোগ সারিয়েছিলেন।

যাঁর কথা তোমাদের কাছে বলতে যাচ্ছি, তিনি হলেন এই কানাই বাবুরই ছেলে, নাম তারকনাথ ঘোষাল। বড় হয়ে সন্ন্যাসী হলে তাঁর নাম হয় স্বামী শিবানন্দ।

খেলায় সকলেই আনন্দ পায়। খেলার মত আনন্দ আর কিছু আছে বলে মনে হয় না, তাই ছোট-বড় সবাই খেলা করে। ছোটদের তো কথাই নেই, খেলে তারা আরো বেশী আনন্দ পায়।

তারকও বন্ধুদের নিয়ে খেলা করেন আর আনন্দে মেতে থাকেন। কিন্তু খেলা করতে করতে তারক মাঝে মাঝে গম্ভীর হয়ে খেলা বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকতেন। খেলার সংগীরা তা দেখে ভাবত—এ কি হল তারকের ?

আয় না তারক, খেলবি আয়, বলে তারককে তারা ডাকত। কিন্তু তারক কোন উত্তর করতেন না, চুপ করে থাকতেন।

ছেলেরা অবাক্ হয়ে যেত। তাঁকে আনতে না পেরে ফিরে এসে আবার নিজেদের মধ্যে খেলা শুরু করে দিত।

তারক মনে মনে কি ভাবত সে-ই জানে! খুব ছোট বেলা থেকেই তাঁকে মাঝে মাঝে নির্জনে বসে ধ্যান অভ্যাস করতে দেখা যেত। খেলা করতে করতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যাওয়া এও হতে পারে, তখন ধ্যান করার জন্য তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠত। তাঁর বন্ধুরা কি করেই বা তা জানবে বল? তারা তো আর জানত না যে এই তারকই পরে বড় হয়ে মহাপুরুষ হবেন।

তারক ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলেন।

উপযুক্ত বয়স হয়েছে দেখে বাবা তাঁকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। সেখানেও অনেকগুলো ছোট ছোট সংগী পেয়ে তারকের মনে আনন্দের সীমা রইল না।

তারক পড়াশুনা করেন, স্কুলে যান, কখন কখন বাপ-মায়ের কাজে সাধ্যমত সাহায্য করেন।

রামকৃষ্ণদেব থাকেন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে। কলকাতায় মাঝে মাঝে বেড়াতে আসেন। সেদিন এলেন রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে।

রামকৃষ্ণের সংগে তারকের দেখা হল। তারক প্রথম দিনের দর্শনেই রামকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হলেন।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের কাছে তারক দীক্ষালাভ করলেন। দীক্ষালাভের পর উৎসাহ ও উদ্যমে সাধন-ভজনে মন দিলেন। গুরুর দেওয়া মন্ত্র পেয়ে সেটি নিজের জীবনে মুক্তোর মত ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি অতল সাধনসাগরে ডুব দিলেন।

রামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর বরানগর মঠ প্রতিষ্ঠার কথা আগে বলা হয়েছে। বরানগর মঠে তারকও এসে যোগদান করেন। সেখানে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে স্বামী শিবানন্দ নাম ধারণ করেন।

স্বামী শিবানন্দকে তাঁর গুরুভাইরা মহাপুরুষ মহারাজ বলে ডাকতেন।

এই মহাপুরুষ নামের একটি গল্প আছে,—

একবার বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ ও শিবানন্দ ঠিক করলেন, তাঁরা বুদ্ধ গয়ায় যাবেন এবং যেখানে বুদ্ধদেব তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, তাঁরাও সেখানে তপস্যা করবেন।

তাঁরা তিনজনে মিলে কাশীপুর বাগান-বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

করুণা ও মৈত্রীর পীঠস্থান বুদ্ধগয়া। প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ ভিক্ষাপাত্র সম্বল করে একদিন এই পবিত্র স্থানে জীবের মুক্তির পথ, শান্তির উপায় কঠোর সাধনা করে পেয়েছিলেন।

আজ আবার নবীন ত্যাগী তিনজন যুবক শান্তির উপায় অন্বেষণে এসেছেন এই সিদ্ধ বোধিমূলে।

তিনজন বসেছেন যোগাসনে।

হঠাৎ একি অলৌকিক দৃশ্য! বিবেকানন্দ দেখলেন, স্বর্গ থেকে একটা

জ্যোতি এসে ধীরে ধীরে শিবানন্দের মধ্যে প্রবেশ করে অদৃশ্য হল। যেন বুদ্ধদেব জ্যোতির্ময় রূপ ধরে এসে শিবানন্দের মধ্যে প্রবেশ করলেন!

উদারহৃদয় বিবেকানন্দ আর স্থির থাকতে পারলেন না। চোখের জল তাঁকে এক আনন্দময় রাজ্যে টেনে নিয়ে গেল! তিনি শিবানন্দকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ভাই, তুমি মহাপুরুষ।

সেদিন থেকে শিবানন্দ সকলের কাছে মহাপুরুষ মহারাজ নামে পরিচিত হলেন।

আনন্দ সবাই চায়। শুধু মানুষ নয়—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সকলেই আনন্দ কামনা করে। মানুষ মানুষকে ভালবাসে, এ নতুন কথা কিছুই নয়। কিন্তু মহান এমনও সব ব্যক্তি আছেন, যাঁরা মানুষের মত পশু-পক্ষীকে সমান ভালবাসেন। আমাদের মহাপুরুষ মহারাজ ছিলেন সে-সব মহান্ ব্যক্তিদের মধ্যে একজন।

মহাপুরুষ মহারাজ জন্তু-জানোয়ারদেরও খুব ভালবাসতেন। তাঁর সংগে সব সময় একটা কুকুর থাকত। বিলিতি কুকুরের চেয়ে তিনি দিশী কুকুরই বেশী পছন্দ করতেন।

বরানগর মঠে কুকুর ছিল না। সেখানে একটা শিয়ালকে আদর করে খাওয়াতেন। বরানগর মঠে তাঁরা কত কষ্টে দিন কাটাতেন তা তোমরা আগেই জেনেছ। নিজেদের খাবার জুটত না, অথচ একটা শিয়ালকে খাবার দিতে তিনি ইতস্তত করতেন না। নিজে না খেয়েও তিনি তাকে খাইয়ে আনন্দ পেতেন।

তিনি শিয়ালটার নাম রেখেছিলেন ভোঁদা। বরানগর মঠের ওপরের ঘরে মহাপুরুষ মহারাজ থাকতেন। রুটি নিয়ে ভোঁদা ভোঁদা ডাক দিলেই শিয়ালের বাচ্চাটা নিচে আসত এবং ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে সে যে এসেছে

তা জানাত। তিনি তখন ওপরের জানালা থেকে দু'চার খানা রুটি ফেলে দিতেন। ভোঁদা রুটি পেয়ে ল্যাজ নেড়ে আনন্দ প্রকাশ করত।

ভালবাসা এমনই জিনিষ, তাতে সকলেই মুগ্ধ হয়। জন্তু-জানোয়াররা আমাদের কথা বুঝে না। আমরাও তাদের কথা জানি না। কিন্তু তাদের যদি কেউ ভালবাসে, তবে তারা তা বেশ বুঝতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনীতে আমরা দেখতে পাই, তিনি যখন মাঠে রাখাল সেজে গরু চরাতেন তখন গরুর পাল তাঁকে ঘিরে থাকত এবং তাঁর গা চেটে দিত।

মহাপুরুষ তখন বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ। বাগান-বাড়ি ঘুরে ঘুরে বেড়ান আর সব কিছু দেখেন। তিনি বাগানে বেড়াতে এলে গরু, কুকুর প্রভৃতি ছুটে তাঁর কাছে আসত। তিনিও তাদের ভালবাসা জানিয়ে তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন এবং তাদের সংগে কথা বলতেন।

মহাপুরুষ মহারাজ আনন্দময় পুরুষ। দুঃখ কষ্ট, অভাব অভিযোগ বা শারীরিক ক্লেশ—কোন কিছুতেই মনকে চঞ্চল হতে দিতেন না। তাঁর মুখে সব সময় হাসি লেগেই থাকত। তাঁর কাছে এসে সকলেই ভুলে যেত তাদের অভাব অভিযোগ ও দুঃখ কষ্ট, ফিরে যাবার সময় নিয়ে যেত অপূর্ব আনন্দ।

বরানগর মঠ তপস্যা আর কঠোরতার জন্য বিখ্যাত। মহাপুরুষ মহারাজও কিছুদিন সেখানে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তিনি কাশী ও ভারতের বহু তীর্থ স্থানে ঘুরে ঘুরে অনেক তপস্যা করেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে ভারতে ফিরে এসে দিকে দিকে প্রচারকের দল প্রেরণ করেন; স্বামী শিবানন্দকে পাঠালেন সিংহলে।

সিংহলে তিনি প্রায় এক বছর ছিলেন এবং অনেক সভায় বক্তৃতা করেন। তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য অনেক সায়েব-মেমও আসত।

সিংহলের প্রচারের কাজ শেষ করে তিনি বেলুড় মঠে ফিরে আসেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের দেহত্যাগের পর মহাপুরুষ মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভাপতি হন।

বেলুড় মঠ এখন অনেক বড় হয়েছে। এই মঠ প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকে খুবই কষ্টে সাধুদের দিন কেটেছে। অনেক সময় দেখা যেত, কারুর জামা নেই, জুতা নেই। মঠ চালাবার মত পয়সা নেই। মহাপুরুষ মহারাজ সে সময় মঠের উন্নতির জন্য খুব পরিশ্রম করতেন।

কারুর জামা কাপড় না থাকলে নিজের জামা কাপড় দিয়ে দিতেন বা নিজের পয়সা দিয়ে তাঁদের কিনে দিতেন।

কাশী ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থানের অন্যতম। সেখানে শত শত দেব-দেবীর মন্দির আছে। তার মধ্যে বিশ্বনাথের ও অন্নপূর্ণার মন্দির বিখ্যাত। বছরে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীর দল আগমন করে। এমন সুন্দর ও পবিত্র স্থানে একটি আশ্রম করার জন্য মহাপুরুষ মহারাজের মন চঞ্চল হল। তিনি সেখানে অদ্বৈত আশ্রম নামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন।

কাশীতে যখন তিনি তপস্যা করতেন তখন রোজ ভিক্ষে করে আহার করতেন। দিনে একবার ভিক্ষে করে আনতেন। ভিক্ষাতে তিনখানা রুটি পেতেন। এই তিনখানা রুটি থেকে একখানা দান করতেন আর রাত্রের জন্য একখানা রেখে বাকী একখানাতেই দিনের আহার সেরে নিতেন।

মহাপুরুষ মহারাজের অনেক শিষ্য ছিল। শিষ্যদের মধ্যে রাজা, জমিদার প্রভৃতি বহু বড়লোকও ছিলেন।

বেলুড় মঠে প্রত্যহ বহু লোক তার সংগে দেখা করতে আসত এবং তাঁকে প্রণাম করে অনেক টাকাকড়ি দিত। তিনি সে সমস্ত টাকা পয়সা সবই গরিবদের বিলিয়ে দিতেন।

মহাপুরুষ সত্যি মহাপুরুষ ছিলেন।

স্বামী সারদানন্দ

কলকাতা শহর।

গাড়ি ঘোড়ার ঘড় ঘড় শব্দ আর মানুষের কলরব চলেছে বিরামহীন শহরের বুকের উপর দিয়ে। হ্যারিসন রোড শহরের একটি বড় রাস্তা। তারই উপর গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়ি।

গিরিশ বাবুর পাশের বাড়িতে যাঁরা বাসকরেন তাঁরা বেশ টাকা-পয়সাওয়ালা বড়লোক। তাঁদের বাড়িতে একটি চাকরানী ছিল। সে অনেক দিন যাবৎ সেখানে কাজ করত। তার কলেরা হয়েছে।

কলেরার নাম শুনলেই লোক ভয়ে আতংকে শিউরে ওঠে। বাড়ির ঝির কলেরা! বড়লোকের বাড়িতে গরিব রোগী। তাও আবার সংক্রামক রোগ! বাড়ির কর্তা তাড়াতাড়ি ঝিকে নিয়ে ওপরের ছাদে খোলা জায়গায় ফেলে রাখলেন। তিনি রোগীর চিকিৎসা বা শুশ্রূষার কোন ব্যবস্থাই করলেন না।

গিরিশ বাবুর ছেলে শরত তা দেখতে পেয়ে রোগীর কাছে ছুটে গেলেন।

তখন সন্ধ্যা হয়েছে। খোলা ছাদের ওপর ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে রোগীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল। শরত সাধ্যমত তার সেবা করতে লাগলেন। এ ভাবে সারারাত কেটে গেল। পরদিন ঝি মারা গেল।

এখন ঝির সৎকারের ব্যবস্থা করা দরকার। বাড়ির কর্তা তার কিছুই ব্যবস্থা করলেন না। শরত তখন পাড়ার লোকদের ডেকে এনে তার সৎকারের সব ব্যবস্থা করলেন।

শরত তখন খুবই ছোট। বয়স পনের ষোল হবে। কিশোর বয়সের একটি ছেলেকে এ ভাবে কলেরা রোগীর কাছে ছুটে যেতে দেখে তোমরা

অবাক হয়ে যাচ্ছ, না? অবাক হবারই কথা বটে। তখনকার দিনে চোখের সামনে মরতে দেখলেও কেউ কাউকে সাহায্য করত না; ভয়ে পালিয়ে যেত।

আজকাল দেশের কোথাও কলেরা বসন্ত মহামারী প্লাবন ভুমিকম্প দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি হলে দুর্গতদের সেবার জন্যে হাজার হাজার যুবক আত্মদান করে, শত শত সমিতি সেবাকাজে এগিয়ে আসে। কিন্তু সে সময় এ রকম ছিল না। স্বামী বিবেকানন্দই দেশের যুবকদের মধ্যে এই প্রেরণা জাগিয়ে তোলেন। কলকাতায় প্লেগের সেবাকার্য থেকেই এই প্রেরণার সূত্রপাত।

বিবেকানন্দ দেশে সেবাধর্ম প্রবর্তন করার আগে পর্যন্ত লোক ধর্ম ও সেবাকে এক করে দেখতে শেখে নি, এ কথা খুবই সত্য।

আর বিবেকানন্দ এ ভাবটি পেয়েছিলেন তাঁর গুরু রামকৃষ্ণের কাছ থেকে।

দেশের লোকেরা রামকৃষ্ণদেবকে মহাসাধক ও ধর্মগুরু বলেই জানে। তাঁরই শিষ্য বিবেকানন্দ দেশ-বিদেশে রামকৃষ্ণের বাণী প্রচার করেছেন।

প্লেগের সেবাকাজের পর থেকে স্বামীজীর ওপর দেশের লোকের ভক্তি বিশ্বাস বেড়ে গেল। তাঁর ডাকে ভারতে সাড়া পড়ে গেল। দেশে দেশে গড়ে উঠল সেবাব্রতীর দল।

বিবেকানন্দ বাছা বাছা কয়েকজন যুবককে নিয়ে করলেন রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা। মিশনের সম্পাদক করে স্বামী সারদানন্দকে দিলেন পরিচালনার ভার। সারদানন্দ জীবনের শেষ দিন অবধি সে কাজ পরিচালনা করে যান।

আজ যে রামকৃষ্ণ মিশন এত বড় হয়েছে তার গোড়ার দিকের কথা বলতে গেলে বলতে হয় সারদানন্দের কঠোর পরিশ্রমের জন্যই তা সম্ভব হয়েছে।

গিরিশ বাবুর ছেলে শরতের বাল্যকাল থেকেই সেবাভাব আমরা

দেখেছি। কাজেই, সেবাব্রতী শরতের হাতে একটা সেবা প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠবে বই কি!

পৌষ মাসের এক শীতের রাতে আমাদের শরত এসে মাটির পৃথিবীতে ধরা দিয়েছিলেন। সেই দিনটি ছিল বার-শ' বাহাত্তর সালের সাতই পৌষ। শরতের আগমনের আগে থেকেই আরো তিনটি প্রাণী এসেছিলেন গিরিশ বাবুর বাড়িতে। তাঁরা হলেন শরতের দিদি।

তিন মেয়ের পর গিরিশ বাবুর এই প্রথম ছেলে। আমাদের বাঙালীর ঘরে সাধারণত মেয়ের চেয়ে ছেলের আগমনে আনন্দ উৎসব হয় বেশী। তার ওপর পরিবারের মধ্যে যদি প্রথম ছেলে হয়, তবে তো আর কোন কথাই থাকে না। সংসারে আদুরে দুলাল হয়ে ওঠে সে।

শরত ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে লাগলেন। দেখতে না দেখতে নবাগত সুন্দর শিশুটি নিজের ও পাশের বাড়ির সকলের বুকের ধন, চোখের মণি হ'য়ে উঠলেন।

ধনী গরিব, ভাল মন্দ, ছোট বড়—সব বাপ-মা-ই নিজের ছেলেমেয়েকে অন্তর দিয়ে ভালবাসেন। শরতের মা-বাবাও তাঁকে ভালবাসতেন, একথা না বললেও চলে। শরত শুধু মা-বাবার ভালবাসাই পেয়েছেন তা নয়, তিনি পাড়ার লোকদেরও আদর-যত্ন পেয়েছিলেন।

শিশুরা খেলা করে যে আনন্দ পায় আর কোন কিছুতেই তা পায় না, এ কথা আগেই বলেছি। শিশু শরতও অনেক রকম খেলা করেন। সব খেলার মধ্যে পূজার বাসন নিয়ে খেলা করতেই তিনি বেশী আনন্দ পান। শরতের খেলার সুবিধের জন্য তাঁর বাবা তাঁকে এক সেট্ পূজোর বাসন কিনে দিলেন।

শরত মনের আনন্দে সে সব বাসন নিয়ে খেলা করেন।

শরতকে কেউ কখনও রাগ করতে দেখে নি। কেউ তাঁকে বকুনি

দিলে তিনি হাসিমুখে তা সহ্য করতেন। বন্ধুদের সংগে কোনদিনই তাঁর ঝগড়া হত না। শান্ত স্বভাবের জন্য সবাই তাঁকে ভালবাসত।

পাড়ার ছেলেরা মিলে একটি ক্লাব খুললে। ক্লাবে রোজ ডন, কুস্তি, বারবেল খেলা প্রভৃতি নানারকমের ব্যায়াম হত। শরতও সেই ক্লাবের সভ্য হলেন। তিনি মুগুর ভাঁজাই বেশী পছন্দ করতেন। বেশ বড় রকমের এক জোড়া মুগুর সেই ক্লাবে ছিল। মুগুরের ওজন ছিল পঁয়ত্রিশ সের। তিনি সেই মুগুর ভাঁজতেন।

সব ক্লাবেই খেলা ধূলো নিয়েই ছেলেরা থাকে। কিন্তু শরতদের ক্লাবে খেলাধূলা ছাড়া রোগীর সেবা করা এবং মাঝে মাঝে সভা-সমিতি করে নানা বিষয় আলোচনা হত।

এই আলোচনা সভায় আবৃত্তি, রচনা প্রতিযোগিতা, বিতর্ক আলোচনা হত। কোন কোন দিন মহাপুরুষদের জীবনী সম্বন্ধেও আলোচনা হত।

একবার ক্লাবের উৎসব উপলক্ষে ক্লাবের ছেলেদের দল দক্ষিণেশ্বরে খেলা দেখাতে এল। শরতও তাদের সংগে আছেন। দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণদেব থাকেন, একথা আগেই জেনেছ। শরতের সংগে সেখানে রামকৃষ্ণদেবের দেখা হল।

রামকৃষ্ণদেব তাঁকে অনেক আদর আপ্যায়ন করলেন। এর পর থেকে শরত প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে আসতেন। শরতের ভাই শশী অনেকদিন থেকেই রামকৃষ্ণের নিকট আসতে থাকেন। সন্ন্যাসী হবার পর শশীর নাম হয়েছিল রামকৃষ্ণানন্দ।

শরতকে যথাসময়ে এলবার্ট স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হল। সেখান থেকে তিনি এনট্রান্স পাশ করেন। তারপর সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হলেন। সেণ্ট জেভিয়ার্সে মাত্র অল্পদিন পড়েছিলেন। পরে মেডিক্যাল কলেজে পড়েন।

রামকৃষ্ণের শরীর যাবার পর শরত সংসার ত্যাগ করে বরানগর মঠে চলে আসেন। শরত বুঝেছিলেন, সন্ন্যাস জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করতে হলে কঠোর তপস্যার প্রয়োজন। তাই তিনি বরানগর মঠে কঠোর তপস্যায় নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর শরতের নাম হল স্বামী সারদানন্দ।

বরানগর মঠ থেকে স্বামী সারদানন্দ ভারতের তীর্থস্থান দর্শন করতে বের হলেন। কাশী, লক্ষ্ণৌ, হরিদ্বার ভ্রমণ করতে করতে তিনি হৃষীকেশে এলেন।

হৃষীকেশে সারদানন্দ রয়েছেন। একদিন তাঁর সংগে একজন বৃদ্ধ সাধুর দেখা হল। সাধুটি খুব সাদাসিধে সরল প্রকৃতির লোক। সাধু রোজ গীতা খুলে গীতার পাতা উল্টাতেন। তারপর একটা ছোট লাঠি মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করতেন।

একদিন শরত মহারাজের ইচ্ছে হল তিনি সাধুর কাছে গীতার ব্যাখ্যা শুনবেন। তিনি সাধুকে গীতা পড়ে শুনাতে বললেন।

সাধু ধীরভাবে বললেন, তিনি মূর্খ, গীতার কিছুই জানেন না। এমন কি পড়তেও পারেন না। তবে প্রথানুযায়ী গীতা নিয়ে একবার তার পাতা উল্টান। এ তাঁর নিত্য কর্ম।

স্বামী সারদানন্দ অবাক হয়ে গেলেন!

সাধু তাঁর আগের জীবনের ঘটনা সব বলতে লাগলেন। তিনি ব্রাহ্মণের ছেলে। সংসারও তাঁর ছিল। ছেলেমেয়ে ও পরিবারের খাওয়া-পরার কোন ব্যবস্থা করতে না পেরে তিনি ডাকাতি করতে আরম্ভ করলেন।

পথে লোকজনদের কাছ থেকে ডাকাতি করে যা পেতেন, তা দিয়েই তিনি সংসার চালাতেন। একদিন কোন শিকার মিলল না। বাড়িতে স্ত্রী-পুত্র খিদের জ্বালায় ছট্ ফট্ করছে।

শিকারের সন্ধানে তিনি পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ঘুরতে ঘুরতে পথিমধ্যে একটা শিবমন্দির দেখতে পেলেন।

মন্দিরে অনেক গয়নাপত্র ও টাকা পয়সা আছে মনে করে দরজা ভেঙে তিনি মন্দিরে ঢুকলেন। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে কিছুই পেলেন না। তাঁর রাগ হল। নিকটেই ছিল একটা লাঠি। লাঠিটা নিয়ে তিনি শিবের মাথায় মারতে লাগলেন।

শিবঠাকুরকে মারতে মারতে হঠাৎ তাঁর মনে হল, তিনি একি করছেন। ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে দেবতাকে লাঠি দিয়ে মারছেন। পেটের জ্বালা সইতে না পেরে দেবতার জিনিস চুরি করতে এসেছেন। এ কার জন্য ?

এ সব কথা মনে হতেই সংগে সংগে তাঁর হৃদয় ত্যাগের জ্যোতিতে আলোকিত হল। এত দিন যে ডাকাতি করে পাপ কাজ করে এসেছেন তার জন্যে তিনি অনুতাপ করতে লাগলেন। তারপর তিনি লাঠিটিকে সংগে করে বেরিয়ে পড়লেন এবং ঠিক করলেন আর বাড়ি ফিরবেন না।

চলতে চলতে পথে একজন সাধুর সংগে তাঁর দেখা হল। সেই সাধুর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি সাধন ভজনে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন। এখন আর তাঁর কোন দুঃখ নেই। তিনি বেশ আনন্দে আছেন।

লাঠিটিই তাঁকে সাধুজীবনের পথ দেখিয়েছে, সেজন্যে তিনি তাকে গুরুরূপে পূজো করেন।

স্বামী সারদানন্দের সহনশীলতা ও ধৈর্য অনুকরণীয়। বিপদের মধ্যেও তিনি বিচলিত হতেন না। সাধারণ মানুষের মত মনকে চঞ্চল হতে দিতেন না। তাঁর জীবনের এমন অনেক ঘটনা আছে যা সাক্ষ্য দেয় যে, মৃত্যুকে সামনা সামনি দেখেও তাঁর হৃদয় ও মন কখনও চঞ্চল হয়নি।

আমেরিকা থেকে ফিরে এসে স্বামী সারদানন্দ কাশ্মীর ভ্রমণে চলেছেন। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে টাংগায় চড়লেন।

টাংগাটা ছিল ডাকগাড়ি। দু তিন দিন চলার পর একদিন সকাল বেলায় রাস্তার মোড়ে ঘোড়াটা গেল ভড়কে, দিল এক লাফ। তারপর ছুটল ঢালু পথে চার পাঁচ হাজার ফুট নিচে, যেখানে মৃত্যু অপেক্ষা করছে। পেছনে আসছে একটা প্রকাণ্ড পাথর গড়াতে গড়াতে।

মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু সারদানন্দ একটুও বিচলিত হলেন না। এমন সময় ঘোড়াটা একটা গাছের গুঁড়িতে এসে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল। আর কোচম্যান মেলব্যাগ সহ দূরে ছিটকে গিয়ে পড়ল। সেই বড় পাথরটা গড়াতে গড়াতে এসে ঘোড়াটাকে চাপা দিয়ে গেল, সংগে সংগে ঘোড়াটাও মরে গেল।

কিন্তু সারদানন্দ তখনও টাংগায় স্থির হয়ে বসে আছেন। তিনি গাড়ি থেকে নেমে দেখলেন কোচম্যান অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে। তিনি শুশ্রূষা করে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন।

কোচম্যান সুস্থ হয়ে গাঁ থেকে কয়েকজন লোক ডেকে নিয়ে এল। গাঁয়ের লোকেরা মেলব্যাগ গাড়িতে তুলে দিলে এবং গাঁ থেকে একটা ঘোড়া এনে গাড়ি টানার ব্যবস্থা করে দিলে।

এবার জলে।

তর তর করে বয়ে চলেছে গঙ্গা। নদী-ভরা জল। টলমল টলমল। তারই ওপর দিয়ে পাল টাঙিয়ে চলেছে একটি দেশী নৌকা।

নৌকাতে বহু লোক। স্বামী সারদানন্দও তার দলবল নিয়ে রয়েছেন সেই নৌকায়। মাঝি হালটি বেশ শক্ত করে ধরে মনের আনন্দে বাউল সুরের গান গেয়ে যাচ্ছে। আর মাঝে মাঝে তামাক খাচ্ছে।

এমন সময় পশ্চিম আকাশে একখণ্ড মেঘ দেখা দিল। দেখতে না দেখতেই চারিদিক কালো মেঘে ঘিরে ফেলল। নামল ভীষণ জোরে ঝড় আর বৃষ্টি।

নৌকো তখন ডুবু ডুবু। যাত্রীরা ভয়ে আতংকে চেঁচাতে লাগল। শরত মহারাজ মাঝিদের দেওয়া তামাক খাচ্ছিলেন। তিনি তখনও তামাক খেয়েই যাচ্ছেন।

শরত মহারাজকে এভাবে চুপ করে তামাক খেতে দেখে যাত্রীদের মধ্যে একজন বলে উঠল, আপনি বেশ লোক দেখছি। এদিকে নৌকো ডুবছে আর আপনি মজা করে তামাক খাচ্ছেন।

—তামাক খাব না তো নৌকো না-ডুবতেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে নাকি?

এবার সমুদ্রে।

ভূমধ্য সাগরের বুক চিরে একটি জাহাজ চলেছে বিলাতের দিকে। জাহাজে সাদায় কালোয় মেশানো বহুলোক। যাত্রীদের মধ্যে আমাদের স্বামী সারদানন্দও রয়েছেন।

স্বামী সারদানন্দ আপন মনে সমুদ্রের দৃশ্য দেখছেন। সমুদ্র-যাত্রা তাঁর এই প্রথম। কাজেই, সমুদ্রের অপূর্ব শোভা তাঁর মনকে এক ভাবরাজ্যে নিয়ে গেল।

এমন সময় উঠল ভীষণ ঝড়। ঝড়ের চোটে জাহাজ খুব জোরে দোল খেতে লাগল।

সমুদ্রের ঝড় কত বিপদের, কল্পনা কর দেখি। যেখানে কেবল জল আর জল, কোন কূল-কিনারা নেই। জাহাজ ডুবলে যাত্রীরা যাবে কোথায়?

সম্মুখে মৃত্যু নিশ্চিত জেনে সব লোক আতংকে হতভম্ব হয়ে গেল। জাহাজে কান্নার রোল উঠল। কিন্তু সারদানন্দ চুপ করে বসে আছেন, যেন জাহাজে কিছুই হয়নি। আশ্চর্য মহাপুরুষ বটে! কোন বিপদই তাঁকে টলাতে পারে না। একেই বলে বিপদে যে ধীর সেই তো বীর।

•

স্বামী সারদানন্দকে কেউ কখনও রাগ করতে দেখে নি। কেউ তাঁকে তিরস্কার করলেও তিনি রাগ করতেন না, হাসি মুখে সব কথাই সহ্য করতেন। কোন কর্মী কোন অন্যায় কাজ করলে তিনি তাকে না বকে মিষ্ট কথায় বুঝাতেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলতেন, সহ্য কর, সহ্য কর। যে সয় সে রয়, যে না সয়, সে নাশ হয়।

স্বামী সারদানন্দ ছিলেন সহ্যগুণের জ্বলন্ত উদাহরণ।

সাধারণত সকলেই বিপদে পড়ে বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে এবং বিপদে কি করা কর্তব্য ঠিক করতে না পেরে অস্থির মনে যা তা করে বসে। তার ফলে আরো বিপদ্‌গ্রস্ত হয়।

কিন্তু বিপদে স্বামী সারদানন্দ কখনও ঘাবড়াতেন না। তিনি যা কর্তব্য বলে মনে করতেন তা ঠিকভাবে করতেন। কোন বাধা এলেও তিনি মানতেন না।

তাঁর আর একটি মহৎ গুণ ছিল, কেউ তাঁর কাছে অপরের নিন্দে করতে এলে তিনি শুনেও কানে নিতেন না। তিনি বলতেন, পরনিন্দে তো করবে না-ই, শুনবেও না।

স্বামী সারদানন্দের যে সব গুণের কথা শুনলে তা যদি তোমরা নিজেদের জীবনে ফুটিয়ে তুলতে পার, তবে ভবিষ্যতে তোমরাও তোমাদের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারবে।

স্বামী প্রেমানন্দ

মানুষ মানুষকে ভালবাসে, আদর করে। এটি ভগবানের দান। যে ভালবাসা পায় সে ভাগ্যবান। আর যে ভালবাসা দিয়ে অন্যকে আপন করে নিতে পেরেছে সে আরো ভাগ্যবান।

ভালবাসা দু' রকম—স্বার্থের ভালবাসা আর নিঃস্বার্থের ভালবাসা। এর মধ্যে নিঃস্বার্থ ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ।

যাকে ভালবাসবে, তার মংগল কামনা করে তা করতে হবে। তার কাছ থেকে কোন কিছু পাবার বাসনা থাকবে না। এরই নাম নিঃস্বার্থ ভালবাসা।

আজ যাঁর কথা বলতে বসে তোমাদের এতগুলো কথা বলতে হল, তাঁর সমস্ত জীবনটাই ছিল ভালবাসায় পূর্ণ। তাঁর কাছে যিনি এসেছেন তিনিই পেয়েছেন ভালবাসার অমৃত আস্বাদন। তাঁর ভালবাসার তুলনা হয় না। তিনি কি ভাবে লোকদের ভালবাসতেন তাঁর জীবনী থেকে এখন তোমাদের তা শুনাব।

যাঁর কথা বলতে যাচ্ছি তিনি হলেন স্বামী প্রেমানন্দ। ছোটবেলার নাম বাবুরাম।

বাংলার মধ্যে হুগলী একটি ছোট্ট জেলা। হুগলী জেলার মধ্যে আঁটপুর গ্রাম। গ্রামটি নেহাৎ ছোট নয় আর বাঙালীর কাছেও অজানা নয়।

আঁটপুরের ঘোষ আর মিত্তিরদের নাম সকলেই জানে। কারণ, গ্রামটিতে ঘোষ আর মিত্তিরদেরই প্রতিপত্তি বেশী। ঘোষ বংশের তারাপদ ঘোষ হলেন বাবুরামের বাবা, আর মিত্তির বংশের মাতংগিনী দেবী হলেন তাঁর মা।

মা-বাবা দু'জনেই খুব ভাল, ধার্মিক লোক। সুখের সংসারে তাঁরা বাস করেন।

বাবুরামের শুভাগমনের সংবাদে আঁটপুরের ঘোষদের বাড়িতে আনন্দের ঢেউ উঠেছিল। বাবুরামের জন্মের আগে তারাপদ বাবুর এক মেয়ে হয়। তাঁর নাম কৃষ্ণভাবিনী।

শিশু বাবুরাম ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলেন।

কয়েক বছরের মধ্যেই বাবুরামের আরো দু' জন সংগী হল। তাঁরা হলেন তাঁরই ছোট ভাই।

ক্রমে বাবুরামের স্কুলে যাবার বয়স হল। তাঁর বাবা গ্রামের পাঠশালায় তাঁকে ভর্তি করে দিলেন। দেখতে দেখতে পাঠশালার পড়াও শেষ করে ফেললেন। গ্রামে কোন বড় স্কুল নেই। কাজেই, পড়ার সুবিধের জন্যে তাঁকে আনা হল শহরে, কলকাতায়।

কলকাতায় এসে তিনি এরিয়ান স্কুলে ভর্তি হলেন। কিছুদিন পরে মেট্রোপলিটন ইন্‌ষ্টিটিউশন শ্যামপুকুর ব্রাঞ্চে চলে আসেন। সেই স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

রামকৃষ্ণ কথামৃত একখানি নাম-করা বই। এই বইটির নাম নিশ্চয় তোমরা শুনেছ। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত সেই বইখানা লিখেছেন।

মহেন্দ্রবাবু প্রায়ই রামকৃষ্ণদেবের নিকট আসতেন। তাঁকে সকলেই মাস্টার মশাই বলে ডাকত।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথা তোমরা আগেই জেনেছ। তিনিও তখন মেট্রোপলিটন স্কুলে পড়তেন। বাবুরামের সংগে তাঁর সেখানে আলাপ পরিচয় হয় এবং এই পরিচয় ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

ছাত্রদের মধ্যে ভাল ছেলে দেখতে পেলে মাস্টার মশাই তাদের দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যেতেন। বাবুরামকেও তিনি দক্ষিণেশ্বরে নিয়েছিলেন।

একদিন দক্ষিণেশ্বর বেড়াতে এসে বাবুরাম দেখতে পান পঞ্চবটিতে একদল ছেলে চড়ুইভাতি উৎসব করছে। ছেলেদের মধ্যে রাখাল, নরেন প্রভৃতিও আছেন।

একদল ছেলে রান্না করছে, একদল জল আনতে গঙ্গায় গেছে, অন্যদল কাঠ কুড়তে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাকী সব ছেলেরা খেলা নিয়ে আমোদে মেতে আছে। বাবুরাম আর থাকতে পারলেন না। তিনি এই আমোদ উৎসবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

উৎসবের পর সন্ধ্যায় ছেলের দল যে-যার বাড়ি ফিরে যায়। নরেন ও রাখালের সংগে ভাব করে নিয়ে বাবুরামও তাঁদের সংগে যান।

বেলুড় মঠ অনেকেই দেখেছ, যারা দেখ নি, তারা নাম শুনেছ নিশ্চয়। বেলুড় মঠ ভারতের একটি প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসীর আশ্রম। এই মঠকে দেখবার জন্য দেশ-বিদেশ থেকে লোকজন আসে।

বাবুরাম মহারাজের সময় যারা মঠে বেড়াতে অসতেন তিনি তাদের সকলকে ভালবেসে প্রসাদ, ফল, মিষ্টি, কত কিছু খাইয়ে দিতেন। শুধু তাই নয়, প্রত্যেককে নিজের লোকের মত আদর আপ্যায়ন করতেন। তাঁর ভালবাসায় ভুলে যেত তারা দুঃখ কষ্ট, সংসারের শোক তাপ।

ছোটদেরও তিনি খুব ভালবাসতেন। ছোটদের প্রতি তাঁর কিরূপ ভালবাসা ছিল এখানে তার একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

ফাল্গুন মাসে রামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব যখন হয় তখন বেলুড় মঠে লক্ষ লক্ষ লোক এই উৎসব দেখতে আসে। এত লোকসমাগম যেখানে হয় সেখানে স্বেচ্ছাসেবকও প্রয়োজন হয় বহু। তাই হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক কাজ করার জন্য সেদিন বেলুড়ে আসে।

একবার একজন স্বেচ্ছাসেবক সারাদিন উৎসবের খাটুনি খেটে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সন্ধ্যায় সে একটা বেঞ্চে শুয়ে পড়ে।

বেলুড়ে যারা গেছ তারা জান সেখানে কি রকম মশার উপদ্রব হয়। সন্ধ্যা হলে কোথাও চুপ করে বসার উপায় নেই। এক মিনিট বসতে না বসতেই ঝাঁকে ঝাঁকে মশা এসে অস্থির করে তোলে।

স্বেচ্ছাসেবকটি মশার আক্রমণে অস্থির হয়ে ওঠে, ঘুমুতে না পেরে ছটফট করতে থাকে।

বাবুরাম মহারাজ এমন সময় পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তার কষ্ট সইতে পারলেন না। তখনই তিনি একখানা পাখা নিয়ে তার পাশে বসে হাওয়া করতে থাকেন।

রাত ক্রমে গভীর হতে থাকে। তবু স্বামী প্রেমানন্দ তার পাশে বসেই আছেন। তাঁকে শোবার ঘরে দেখতে না পেয়ে তাঁর সহকর্মিগণ খোঁজ করতে লাগলেন। খুঁজতে খুঁজতে তাঁকে সেখানে পাওয়া গেল।

—মহারাজ কি করছেন? রাত যে অনেক হল, ঘুমুতে যাবেন না?

—আহা, বেচারা সারাদিন খেটে একটু বিশ্রাম করতে এসে শুয়েছে, মশার জালায় তাও পাচ্ছে না, তাই মশা তাড়াচ্ছিলুম।

কলকাতার কোন সম্ভ্রান্ত বংশের একটি ছেলে খারাপ ছেলেদের সংগে মিশে গোল্লায় যাচ্ছিল। ছেলেটির আত্মীয়-স্বজনেরা বহু চেষ্টা করেও তাকে সৎপথে আনতে পারলেন না। তাঁরা হতাশ হয়ে পড়েন এবং সকলেই মনে ক'রে নিলেন, এই ছেলেকে আর ভাল করা যাবে না।

ছেলেটির একজন আত্মীয় স্বামী প্রেমানন্দের নিকট আসতেন। তিনি একদিন বাবুরাম মহারাজকে ছেলেটির কথা সব জানালেন। ছেলেটি যাতে ভাল হয় তার জন্যে আশীর্বাদ করতে বললেন।

বাবুরাম মহারাজ সমস্ত ঘটনা শুনে সেই ভদ্রলোককে কথা দিলেন তিনি তাকে দেখতে যাবেন। পরে তিনি একদিন ছেলেটির বাড়ি যান এবং

তার সংগে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলেন। কথাবার্তার পর তাকে নিয়ে তিনি বেলুড় মঠে ফিরে এলেন।

মঠে এসে বাবুরাম মহারাজ তাকে ভাল ভাল খাবার খেতে দিলেন। ছেলেটি আমোদ করে তা খেলে। মঠে তখন গান হচ্ছিল। খাওয়া দাওয়ার পর ছেলেটি গান শুনতে গেল। গান শোনার পর সে বাড়ি চলে যায়।

বাবুরাম মহারাজের নিঃস্বার্থ ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে ছেলেটি ভাবে, কি সুন্দর লোক তিনি। এত ভাল মানুষও সংসারে আছে!

কিছুদিন পরে স্বামী প্রেমানন্দ ছেলেটিকে মঠে নিয়ে এলেন এবং নিজের সংগে রেখে শিক্ষা দিতে লাগলেন।

ছেলেটির এমন কতকগুলি খারাপ অভ্যাস হয়েছিল, তা বলার নয়। সে খুব নেশাখোরও ছিল। নেশার জিনিস না হলে তার একদিনও চলত না। সন্ন্যাসীদের সংগে মঠে আছে, এখন নেশার জিনিস পায় কোথায়। সে বড়ই অসুবিধা বোধ করতে লাগল।

বাবুরাম মহারাজ সব বুঝতে পারলেন, তিনি নিজে পয়সা দিয়ে তার নেশার ব্যবস্থা করে দিলেন।

কথায় বলে, স্বভাবদোষ মরলেও যায় না। ছেলেটিকে তিনি এত যত্ন করছেন, তার সব রকম ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন, তবু সে মাঝে মাঝে সেই আগেকার বন্ধুদের কাছে পালিয়ে যেত।

বাবুরাম মহারাজও ছাড়বার পাত্র নন। সে যতবার পালিয়ে যেত ততবারই তিনি তাকে ধরে আনতেন আর মিষ্ট কথায় বোঝাতেন।

এভাবে একটি খারাপ ছেলেকে নিয়ে পড়ে থাকতে দেখে অনেকেই বাবুরাম মহারারাজকে বললেন, আপনি বৃথা চেষ্টা করছেন। গাধা পিটে কোনদিন ঘোড়া হয় না। এ ছেলেকেও মানুষ করতে পারবেন না।

বাবুরাম মহারাজ সব কথাই শুনে গেলেন, কোন কথার জবাব দিলেন না। তাঁর অসীম ধৈর্যের কাছে সকলের কটুবাক্য হার মেনে গেল।

যা হোক তাঁর স্নেহ ও ভালবাসার টানে ছেলেটি ক্রমে ভাল হয়ে উঠল। পরে ছেলেটি সন্ন্যাসী হয়ে যায় এবং রামকৃষ্ণ মিশনের একজন নামকরা কর্মী হয়ে ওঠে।

বনের পশুপক্ষীকে ভালবাসার দ্বারা বশে অশে আনা যায়, আর একজন মানুষকে পারা যাবে না? বাবুরাম মহারাজ এখানে দেখিয়ে দিলেন কি করে ভালবাসায় হৃদয় জয় করতে হয়।

মা-বাবা সন্তানকে ভালবাসেন, তা সকলেই জানে। আমরাও তাঁদের ভালবাসি। বাবা লেখাপড়া জানেন, আমাদের জন্য তিনি উপার্জন করে আনেন। বাইরেও তাঁর খুব সম্মান। এত সব জেনেও আমরা বাবার চেয়ে মাকে বেশী ভালবাসি কেন বল দেখি? মা আমাদের বেশী ভালবাসেন বলেই।

স্বামী প্রেমানন্দের ভালবাসাকে মায়ের ভালবাসার সংগে তুলনা করা চলে। তাঁর ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে অনেকে ভক্তিভাবে তাঁকে বলতেন, তিনি যেন মঠের মা।

ময়মনসিংহ হ'ল বাংলার একটি বড় জেলা। চারিদিকে সবুজ ধানের ক্ষেত আর বর্ষার জলে জলময় স্থান। খাল বিল আর নদীতে চলে নৌকা। জলের ওপর ভেসে বেড়ায় হাঁস, পান-কৌড়ির দল। কি সুন্দরই পল্লীমায়ের সেই শোভা।

ঘারিন্দা ময়মনসিংহ জেলার একটি গ্রাম। গ্রামে আজ আনন্দ উৎসব। বহু দূর দূর গ্রাম থেকে ছুটে আসছে ঘারিন্দার দিকে হিন্দু-মুসলমান। উৎসবটি হল—স্বামী প্রেমানন্দ আজ এই গ্রামে আসবেন, বক্তৃতা করবেন।

রাস্তায় লোক চলে আর বলে বেড়ায়, বড় সাধু আসছেন। গাঁয়ের চাষীরা বলে, আমাদের পীর সাহেব আসবেন।

স্বামী প্রেমানন্দ রেল স্টেশন থেকে নামতেই দলে দলে লোক এসে ঘিরে দাঁড়াল ট্রেনখানি। বিপুল জয়ধ্বনির মাঝে এগিয়ে চলেন তিনি। ক্রমে এসে পৌছলেন ঘারিন্দা গ্রামে, যেখানে অপেক্ষা করছে বিশাল জনতা। সভা আরম্ভ হল, বক্তৃতা শুনে লোক মুগ্ধ হল।

সভা শেষ হয়ে যায়। লোকেরা চলে যায় যে-যার পথে। গেল না জন কয়েক জ্ঞানপিপাসিত প্রাণী।

—আপনি বলেন সকলের ভেতর খোদা আছেন। সব ধর্মই সমান, কোন ভেদ নাই। তাই যদি সত্যি হয় তবে আপনি আমাদের ছোঁয়া জল খাবেন কি ?

—মুসলমানের ছোঁয়া খেলে জাত যায় না। হ্যাঁ, তুমি নিয়ে এস, তোমার হাতে আমি খাব।

যে মুসলমান ভদ্রলোকটি প্রশ্ন করছিলেন, তিনি একজন সম্ভ্রান্ত লোক। তিনি একথালা খাবার এনে স্বামী প্রেমানন্দকে দিলেন। তিনি কোন সংকোচ না করে তা গ্রহণ করলেন।

বাবুরাম মহারাজ বলেন, রামকৃষ্ণদেব এসেছিলেন হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া মেটাতে। তিনি হিন্দু হয়েও মুসলমান ধর্মে দীক্ষা নিয়ে নমাজ পড়তেন ও সাধন করতেন। রামকৃষ্ণের এই সাধনার মূলে ছিল হিন্দু-মুসলমানকে একত্রে মিলিয়ে দেওয়া। স্বামী প্রেমানন্দ দেখালেন মিলনের এই উপায়।

জাতি যদি এই মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যায়, তবে দেশের শান্তি ফিরে আসবে এবং হবে জাতির পক্ষে মহা কল্যাণ।

প্রেমানন্দ ময়মনসিংহ থেকে গেলেন ঢাকায়।

গ্রামকে তিনি বেশী ভালবাসেন। গ্রামের চাষীরা সরল। শহরের কুটিলতা তাদের ভেতর ঢুকতে পারে নি। ঢাকা এসে তাই তিনি গেলেন গ্রামে।

যে গ্রামে তিনি এসেছেন তার নাম হাসারা। হাসারা এসে দেখলেন, কচুরিপানায় ভরে গেছে সব পুকুর। গ্রামের লোকেরা সেই পুকুরের জল পান করে। তারা বছরের বেশীর ভাগ সময় তাই ভোগে ম্যালেরিয়া কলেরা প্রভৃতি রোগে।

গ্রাম থেকে তিনি বেছে নিলেন একদল কর্মঠ যুবক। যুবকদের উৎসাহী করে তাদের নিয়ে নেমে পড়লেন জলের পানা পরিষ্কার করার কাজে।

ছেলেরা উৎসাহ পেয়ে একে একে গাঁয়ের সব কয়টা পুকুরই সাফ করে ফেললে।

এই ভাবে এক গ্রামের পুকুর সব পরিষ্কার করে তিনি আবার অন্য গ্রামে গিয়ে সেখানেও ছেলের দল নিয়ে লেগে যান পানা পরিষ্কার করতে।

এভাবে দু' তিন মাস কঠোর পরিশ্রম করার পর তিনি অসুখে পড়লেন, হল ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়া থেকে ক্রমে কালাজ্বরে পরিণত হল। চিকিৎসার জন্যে তাঁকে আনা হল বেলুড় মঠে।

এর কিছুদিন পরে তিনি দেহত্যাগ করেন। দুর্দশাগ্রস্ত গ্রামবাসীদের দুঃখ সইতে না পেরে তাদেরই জন্যে করলেন জীবনপাত।

স্বামী প্রেমানন্দ ছোটদের খুব ভালবাসতেন। এ-কথা আগেও বলেছি। তিনি যখন যেখানে গেছেন, ছোটদের নিয়ে কাজ করেছেন। গ্রামে পানা পরিষ্কার করার কাজও তিনি ছোটদের নিয়েই করেছেন।

আমাদের তিনি যে ভালবাসা শিখিয়ে দিয়ে গেছেন, তা যেন আমরা ভুলে না যাই। তাঁর নিঃস্বার্থ ভালবাসা আমাদের সকলকেই শিখতে হবে। এটি সকলের মনে রাখতে হবে।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব লেখাপড়া বিশেষ কিছুই জানতেন না। কিন্তু তাঁর শিষ্যেরা ছিলেন সবাই বড় বড় বিদ্বান। ধর্মসাধনা করতে গেলে গুরুর দরকার হয়। গুরু যা বলেন তাই খুব শ্রদ্ধা করে বিশ্বাস করতে হয় ও সেইভাবে একমনে সাধনা করতে হয়। এ রকম না হলে কখনও ধর্মসাধনা হতে পারে না, পৃথিবীর সকল মহাপুরুষ ও সব ধর্মই একথা বলে।

রামকৃষ্ণদেবের বেলা হল ভারী মুশকিল। তিনি যা বলেন, কোন কথাই তাঁর শিষ্যেরা মেনে নিতে চায় না। বলে, প্রমাণ দাও। আজ-কালকার লেখাপড়া জানা ছেলে তারা। ভাল করে না দেখে শুনে বা পরীক্ষা না করে কারুর কোন কথাই তারা বিশ্বাস করতে চায় না।

যেমন গুরু তেমনি শিষ্য। শিষ্য করবার সময় রামকৃষ্ণদেব তাদের অনেক রকম করেই যে পরীক্ষা করে নিয়েছিলেন, তারাই বা পরীক্ষা করবে না কেন? তাদের এই দেখে শুনে জানবার ইচ্ছে দেখে রামকৃষ্ণের মনে আনন্দ ধরে না। এই রকম শিষ্যই তিনি খুঁজছিলেন।

তাঁর শিষ্যদের পরীক্ষায় রামকৃষ্ণদেব পুরো নম্বর পেয়ে পাশ করলেন। তারপরই তাদের শুরু হল নতুন পথে যাত্রা। কিছুদিন পরই এমন অবস্থা হল যে, গুরুকে ছেড়ে শিষ্যেরা থাকতে পারে না। শিষ্যদের মনে আনন্দের সীমা নেই।

ধর্মসাধনার অনেক রকম নিয়ম, অনেক রকমের জপতপ সব আছে। তার মাঝে একটি প্রধান বিষয় হল, গুরুর সেবা করা। অন্যান্য গুরুরা যেভাবে শিষ্যদের গুরুসেবা করান, রামকৃষ্ণদেব সে রকম কিছুই করতেন না। তিনি শুধু মায়ের মত তাঁর শিষ্যদের ভালবাসতেন। মা যেমন

ছেলেমেয়ের সেবা করেন, তিনিও ঠিক সে রকম তাঁর শিষ্যদের খাওয়াতেন, আদর করতেন, মাঝে মাঝে সেবাও করতেন। গুরু-শিষ্য বলতে আমরা যা বুঝি, তাঁদের ব্যবহার সে রকম ছিল না। তাদের সম্পর্ক ছিল শুধু ভালবাসার।

রামকৃষ্ণদেবের যত শিষ্য ছিলেন, প্রত্যেকেই এক-একটি ভাব নিয়ে খুব উন্নতি করেছিলেন। তার মাঝে শশী ছিলেন যেন সেবার মূর্তি! তাঁর ভেতর আরও গুণ ছিল, কিন্তু তাঁর মত গুরুসেবা আর কোথাও বড় দেখা যায় না। সন্ন্যাসী হবার পর তাঁর নাম হয়েছিল স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। তাঁর কথাই এখানে বলছি।

রামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর তাঁর শিষ্যদের মনে ভয়ানক দুঃখ হল। তাঁরা তখন কি করবেন, কোথায় থাকবেন, কি ভাবে চলবেন ভেবে ঠিক করতে পারছিলেন না। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন শিষ্যদের মধ্যে প্রধান। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী বরানগরে একটি পড়ো বাড়ি নিয়ে সেখানে মঠ স্থাপন করা হল এবং সন্ন্যাসী শিষ্যেরা সবাই ঐ বাড়িতে বাস করতে লাগলেন।

এতকাল প্রতিটি কাজে প্রতিটি বিষয়ে গুরু রামকৃষ্ণদেব তাঁদের পরিচালনা করেছেন। তাঁরা নিশ্চিন্ত মনে সাধন ভজন করেছেন। কিন্তু যদি ভুল হয়, তা হলে আজ কে তাঁদের সংশোধন করে দেবে, নিত্য নতুন প্রেরণা দিয়ে তাঁদের উন্নতির পথে নিয়ে যাবে!

বিবেকানন্দ বললেন, আমাদের অত ভয় পাবার কি আছে? আমাদের গুরুদেব কি সত্যি সত্যি মারা গেছেন? তাঁর শরীরটি নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু তিনি আমাদের সংগে ঠিকই আছেন। সাধারণ লোক ও তাঁদের গুরুদেবে যে অনেক তফাৎ! সাধারণ লোকেরা মরে, কিন্তু তাঁদের গুরুদেবের মত মহাপুরুষদের কখনও মৃত্যু হয় না। তাঁরা অমর।

বিবেকানন্দের কথায় সকলের প্রাণে আবার নতুন উৎসাহ জেগে উঠল। গুরুদেব রামকৃষ্ণ রাতদিন তাঁদের সংগে সংগেই আছেন। তিনি আগের মত তাঁদের ভালবাসেন, আগের মতই তাঁদের রক্ষা করছেন, একথা সত্যি সত্যি তাঁরা অনুভব করতে লাগলেন।

তাঁদের তখন খাওয়া-পরার ভয়ানক কষ্ট। একজন বললেন, গুরুদেব আমাদের দেখছেন, তা হলে আমাদের এত কষ্ট কেন ?

আর একজন জবাব দিলেন, এগুলো তাঁর পরীক্ষা। ভগবানের জন্যে যথাসর্বস্ব ত্যাগ করতে আমরা রাজী আছি কিনা, গুরুদেব তাই পরীক্ষা করছেন।

ব্যস, এর পর আর কথা চলে না।

এ দিকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কোত্থেকে একখানি ফটো জোগাড় করে আনলেন। পরমহংসদেবের ফটো। পড়ো বাড়ির একখানি ভাল ঘর বেশ পরিষ্কার করে ফটোখানি তিনি বসালেন। তাতে শিষ্যদের মনের উৎসাহ যেন হাজার গুণ বেড়ে গেল। গুরুদেবকে যেন তাঁরা চোখের সামনে দেখতে লাগলেন।

পরমহংসদেবের একটি বিশেষ শিক্ষা ছিল—যা করবে, মনে প্রাণে করবে। রামকৃষ্ণানন্দ ভাবলেন, শরীর না থাকলেও তিনি তো ঠিকই আমাদের মাঝে আছেন। গুরুদেব যখন সশরীরে আমাদের মাঝে ছিলেন তখন আমরা যে-ভাবে তাঁর সেবা করেছি, আমাদের উচিত আজও ঠিক সেই ভাবে তাঁর সেবা করা। কিন্তু তাঁর শরীর যে নেই ! নাই বা থাকল। ফটো তো আছে। তিনি ফটোকেই সেবা করতে লাগলেন। রান্না করে ভাত বেড়ে সকলের আগে ফটোর সামনে রাখতেন। বলতেন, ঠাকুর, রান্না হয়েছে, এবার খাও।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের জীবনের কয়েকটি ঘটনা এখন তোমাদের কাছে

বলব। তাঁর ছোট বেলাকার নাম ছিল শশীভূষণ, তা তোমরা আগেই জেনেছ। শশীভূষণের বাবার নাম ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী। ঈশ্বরচন্দ্র তন্ত্র সাধনা করতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র কালীপূজো করতেন। কালীপূজোতে অনেক রকম নিয়ম আছে। যাঁরা কতকগুলো বিশেষ নিয়ম পালন করে চলেন, তাঁদের বলা হয় তান্ত্রিক সাধক।

এসব তান্ত্রিক সাধকেরা সাধারণত শ্মশানে থেকে উপাসনা করেন। তাঁদের কপালে রক্তচন্দন, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ও পরনে লাল রঙের কাপড় থাকে। মরা মানুষের মাথার খুলির ওপর বসে তাঁরা সাধন করেন।

ঈশ্বরচন্দ্রও সেরূপ শ্মশানে গিয়ে সাধনা করতেন। তিনি বড় বড় দাড়ি ও লম্বা চুল রাখতেন। তাঁর মোটা চেহারাতে এ পোশাক বড় সুন্দর দেখাত। তাঁকে দেখে মন হত যেন একজন ঋষি।

প্রাচীনকালে বড় বড় সাধকদের বলা হত ঋষি। সে সব ঋষিরাও খানিকটা ঐ ধরণের পোষাক পরতেন।

মেদিনীপুর জেলার ইচ্ছাপুর গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র থাকতেন। ইচ্ছাপুর গ্রামের পাশেই ছিল ঘটেশ্বর শ্মশান। তিনি সেই শ্মশানে রাত্রে সাধন করতেন। কোন কোনও দিন নদীর ধারে বা বট অশ্বত্থ বেল অথবা নিম গাছের তলায় বসেও গভীর রাত পর্যন্ত তিনি জপ-তপ করতেন।

একদিন রাত্রে ঈশ্বরচন্দ্র গেছেন সাধন করতে মহাশ্মশানে। সাধনের কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরছিলেন। রাত তখন অনেক হয়েছে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এমন সময় মানুষের পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে তিনি থমকে দাঁড়ান। দেখলেন একটি ছোট মেয়ে সে পথ দিয়ে যাচ্ছে।

—এত রাত্রে কে তুমি মা? কোথায় যাচ্ছ বল তো? তুমি একা কেমন করে এলে?—বলেই ঈশ্বরচন্দ্র মেয়েটির কাছে এগিয়ে গেলেন।

মেয়েটি তাঁকে দেখেই ছুটে পালাল। কোন কথাই বললে না। তিনি মেয়েটির পেছনে পেছনে ছুটে গেলেন। মেয়েটি তখন ছুটতে ছুটতে মন্দিরের কাছে গিয়ে কোথায় পালিয়ে গেল আর দেখা গেল না।

তিনি তখন বুঝলেন, মা কালী বালিকার রূপ ধরে তাঁকে দেখা দিয়ে পালিয়ে গেলেন।

শশীভূষণের মায়ের নাম ছিল ভবসুন্দরী। তিনি খুব সরলা এবং লজ্জাবতী মেয়ে ছিলেন।

তাঁদের বাড়িতে নারায়ণ, মনসা, শীতলা এবং সিংহবাহিনী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজো হত। সংসারের কাজে তিনি খুব বেশী লিপ্ত থাকতেন না। এ সব পূজো-পার্বণ নিয়েই তাঁর বেশী সময় কেটে যেত।

প্রত্যেক মানুষের জীবনের একটি স্বাভাবিক গতি বা ধারা আছে। তারা তাতেই সন্তুষ্ট থাকে এবং কতকগুলো কাজ নিয়ে ও অভ্যাসের স্বাভাবিক ধারার মধ্যেই তাদের দিন কোনোপ্রকারে কেটে যায়। এর বেশী তারা চায় না। কিন্তু এক-একটি মানুষ মাঝে মাঝে দেখা যায়, যাঁরা এই স্বাভাবিক জীবনধারায় সন্তুষ্ট হতে পারেন না। সাধারণের চাইতে তাঁরা আরো একটু ভাল হতে চান, অগ্রবর্তী হবার আকাঙ্ক্ষা করেন নিজের জীবনে এবং সমাজ-জীবনে।

শশীও ছিলেন ঠিক সেই প্রকৃতির লোক। শিক্ষা লাভের সময় জীবনটি তাঁর একটি বিশিষ্ট রূপ নিয়ে আসে। তিনি বি-এ পরীক্ষা না দিয়েই সংসার ত্যাগ করেন।

শশী বাপ-মায়ের বড় ছেলে। সব মা-বাবাই আশা করেন, বড় হয়ে ছেলে রোজগার করে এনে দেবে, আর তাঁরা বুড়ো বয়সে সুখে দিন কাটাবেন। কিন্তু শশীর বেলায় তা সম্ভব হল না। শশীর কাজে তাঁর মা-বাবা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না।

শশী বরানগর মঠে সকলের সংগে যোগদান করলেন। কিছুদিন পরে গুরুর সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিলেন। গুরুসেবার কথা আগেই পেয়েছ।

শশী বাড়ি ছেড়ে সন্ন্যাসী হতে চলে গেলেন। তাঁর মা-বাবার মনে দারুণ আঘাত লাগল। বাবা তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য যতবার চেষ্টা করেন শশীও তাঁকে ততবার ফিরিয়ে দেন। বাবা কত বোঝান—তোমার মা তোমার জন্যে কেঁদে কেঁদে দিন কাটান। তিনি কিছুই খান না। না খেয়ে তাঁর শরীর খারাপ হয়ে গেছে। ঘরে চল বাবা। সংসারে থেকে কি ধর্ম হয় না? দেখ না, মাস্টার মশাই কেমন সংসারে থাকেন আবার মঠে এসে সাধু সংগ করেন। তুমিও ঘর-সংসার কর, আবার মঠে এসে সাধুসংগ কর, তাতে আমরা কোন বাধা দেব না।

বাবা এত বুঝিয়েও শশীর মন টলাতে পারলেন না। তখন ঈশ্বরচন্দ্র যান ভীষণ রেগে। রাগের চোটে শশীর গুরু রামকৃষ্ণদেবের নিন্দা শুরু করে দিলেন।

শশী মা-বাবাকে খুবই ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। কোনদিন তাঁদের মুখের ওপর কোন কথা বলেন নি। আজ বাবার মুখে গুরুর নিন্দে শুনে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। বাধা দিয়ে শশী বললেন, বাবা, তুমি রামকৃষ্ণদেবকে ঠিক ঠিক ভাবে বুঝতে পার নি, তাই তুমি তাঁর নিন্দে করছ। তোমার মুখে এ শোভা পায় না। তুমি জান, গুরুনিন্দে শিষ্যের শুনতে নেই। তুমি আমার বাবা হয়ে কি করে আমার সামনে আমার গুরুর নিন্দে কর বল তো? এ তোমার ভারী অন্যায় হচ্ছে।

ছেলের কথায় ঈশ্বরচন্দ্রের চমক ভাঙল। আর কথা বলা হল না। ঈশ্বরচন্দ্র ছেলের গুরুভক্তি দেখে মুগ্ধ হলেন; তিনি ছেলেকে আশীর্বাদ করে ফিরে এলেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের একটা মহৎ গুণ ছিল, তিনি যখন যে কাজে হাত

দিতেন তা শেষ করে তবে সেখান থেকে উঠতেন। তাঁর কাজ সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হত। এলোমেলো কাজ তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। নিয়ম-শৃংখল মেনে চলা তাঁর জীবনের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল।

যেমন টিয়া পাখির গলায় কাঁটি উঠলে আর পড়ে না, ছানাবেলায় শেখালে শীঘ্র পড়ে, তেমনি বুড়ো হলে সহজে ঈশ্বরে মন যায় না, ছেলেবেলায় তাদের মন অল্পতেই স্থির হয়।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী যোগানন্দ

হিমালয় পর্বত থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশে ঘুরতে ঘুরতে গঙ্গা এসে মিলিত হয়েছে সমুদ্রের বুকে। গঙ্গার তীরে তীরে বসে কত সাধু-সন্ন্যাসী, মুনি-ঋষি তপস্যা করেছেন এবং এখনও কত তপস্বী বসে আছেন, তার কোন হিসাব মেলে না। এইসব তপস্বীদের তপস্যার পুণ্যবলে গঙ্গার জল ও স্থানের মাহাত্ম্য দিন দিনই বেড়ে চলেছে। তাই লোকেরা গঙ্গায় স্নান করে নিজেদের শুদ্ধ পবিত্র মনে করে ধন্য হয়।

একদল মহিলা চলেছেন গঙ্গায় স্নান করতে। মহানন্দে তাঁরা নেমে উঠলেন। ফেরবার পথে একজন তরুণ তপস্বীকে গঙ্গার পাড়ে বসে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়ান।

গৈরিকের পোশাক পরা সন্ন্যাসীর সুন্দর গৌর বর্ণ চেহারা পলাশ ফুলের মত সুন্দর দেখাচ্ছিল। মহিলারা মনে করলেন, ইনি নিশ্চয় কোন বড় ঘরের ছেলে হবেন। এমন সুন্দর ছেলে ঘর বাড়ি ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে চলে এসেছে! আহা, কোন্ মায়ের কোল খালি করে এল গো! মহিলাদের মনের কোণে জেগে উঠল মায়ের বেদনা।

—হ্যাঁ গা, তুমি কাদের ছেলে গা?

—ক্যা কহা মাইজী?

—আরে রাম, এ যে মেড়ো। চল চল, এখানে থেকে কাজ নেই।

নিজের জাতের উপর সকলেরই একটা স্বাভাবিক টান থাকে। মহিলারাও সেই সাধুকে মনে করেছিলেন বাঙালী। তাই বাংলা মায়ের বেদনা তাঁদের ভেতর ফুটে উঠেছিল।

এই সাধু হলেন স্বামী যোগানন্দ। তিনি বাঙালী সাধু। যে সব মহিলারা তাঁর কাছে এসেছিলেন, তাঁরা হলেন যোগানন্দেরই পাড়ার

মেয়ে। পাছে তাঁরা তাঁকে চিনে ফেলেন, তাই তিনি হিন্দীতে কথা বলেছিলেন।

গঙ্গার ধার বেয়ে চলেছে দক্ষিণেশ্বর গ্রাম। দক্ষিণেশ্বরের সংগে তোমরা সকলেই পরিচিত। রানী রাসমণির কালীবাড়ি আর রামকৃষ্ণ দেবের সাধনস্থান পঞ্চবটির জন্য দক্ষিণেশ্বরের নাম আজকাল ছেয়ে গেছে সারা জগতময়। এই কালীমন্দিরের নিকটে ছিল স্বামী যোগানন্দের ছোটবেলাকার বাসস্থান।

যোগানন্দকে ছোটবেলায় তাঁর মা-বাবা যোগেন বলে ডাকতেন। যোগেনের বাবার নাম নবীনচন্দ্র চৌধুরী।

নবীনচন্দ্র দক্ষিণেশ্বর অঞ্চলের একজন নামকরা জমিদার। সাবর্ণ চৌধুরীর বংশ বলে তাঁদের খুব গৌরব ছিল। আর এই চৌধুরীদের এক সময় বাংলায় খুব হাঁক-ডাক ছিল। তাই তাঁদের নাম শুনে অনেকে ভয়ে কাঁপত। লোকে বলত, তাঁদের প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়।

নবীনচন্দ্র পরম ধার্মিক ও সাধক লোক ছিলেন। তাঁর বাড়িতে গৃহ-দেবতার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি প্রত্যহ সকালে নিজ হাতে ফুল তুলে এনে পূজো করতেন। তা ছাড়া নিত্য গীতা ও চণ্ডী পাঠ করতেন। এসব কাজ করে দিনের বাকী সময়টুকু জপধ্যানে কাটিয়ে দিতেন।

নবীনচন্দ্র ফুল তুলতে যেতেন দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির বাগানে। সেখানে একদিন রামকৃষ্ণদেবের সংগে তাঁর আলাপ হয়। রামকৃষ্ণদেবের সংগে আলাপ করে তাঁর খুব ভাল লাগে। তারপর থেকে তিনি প্রায়ই তাঁর কাছে যেতেন।

নবীনচন্দ্র জমিদার। তিনি পূজো-পার্বণ নিয়ে এমন ভাবে মেতে থাকেন যে তাঁর জমিদারী দেখার আর প্রয়োজন মনে করেন না। রাজা যদি রাজ্য না দেখেন তবে তার অবস্থা কি হয়, তোমরা নিশ্চয় ইতিহাসে অনেক

পড়েছ। রাজা যদি রাজকাজে অবহেলা করেন, সে রাজ্য যায় ছারখারে। তাতে প্রজারাও সুখে থাকতে পারে না। তাদের দুঃখ বেড়েই চলে এবং কলহ-বিবাদ লেগেই থাকে।

নবীনচন্দ্রের জমিদারীতে হল তাই। আত্মীয়-পরিজনবর্গের কলহ উপস্থিত হল। তাঁরা মামলা-মোকদ্দমায় নিঃস্ব হতে লাগলেন। ক্রমে তাঁর জমিদারী নষ্ট হয়ে গেল। তিনি গরিব হয়ে পড়লেন। অর্থাভাবে দুঃখের চরম সীমায় পৌছুলেন।

নবীনচন্দ্রের তাতেও দুঃখ নাই। তিনি ঠাকুর-দেবতার পূজো নিয়েই মেতে থাকেন আর মনে মনে ভাবেন, আমার যোগেন বড় হয়ে সব ঠিক করে নেবে। বাবা আমার গৃহলক্ষ্মীকে ফিরিয়ে আনতে পারবে।

শীতের পর বসন্তের আগমনে আমাদের বাংলা দেশে ঘরে ঘরে আনন্দের হিল্লোল ওঠে। কোকিলের সুমধুর কণ্ঠের গানে নেচে ওঠে সবার প্রাণ। আবির কুমকুমের রঙে রাঙিয়ে ওঠে সকলের মন।

চৈত্রের মাঝামাঝিতে দক্ষিণেশ্বর পল্লীতে চৌধুরীদের বাড়িতে যে ছোট্ট শিশুটির আগমন-সংবাদ ঘোষণা ক'রে একদিন শাঁখ বেজে উঠেছিল, সেখানে ঠিক তেমনি এক আনন্দ-কোলাহল শুনতে পাওয়া যেত। বাঙালীর ঘরে সাধারণত মেয়ের চাইতে ছেলের আগমনে আনন্দ উৎসব হয় বেশী। তার ওপর সে যদি হয় পরিবারের প্রথম সন্তান, তবে সে উৎসব-আনন্দ ভরে ওঠে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে।

নবীন বাবুর প্রথম সন্তান যোগেন্দ্রনাথ। এবার তোমরা অনুমান করে নাও, জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের বাড়ির আনন্দ-হিল্লোলের মাত্রা। এর মধ্যে বলতে ভুলে গেছি, যোগেন্দ্রনাথ কোন্ তারিখে এসেছিলেন এই পৃথিবীতে। তিনি এসেছিলেন বারশ' সাতষট্টি সালের আঠারোই চৈত্র।

যোগেন বাড়তে বাড়তে পাঁচ বছরে পড়ল। এখন সে ছুটাছুটি করে বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে পারে। পাড়ার ছেলেরাও মনের আনন্দে তাঁর সাথে খেলা করে।

যোগেন খেলা তো করত ভালই। কিন্তু সে মাঝে মাঝে খেলা করতে করতে কেমন যেন হয়ে যেত। কারুর সংগে কথা না বলে চুপ করে থাকত। আবার কখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেত। অজ্ঞান হলেও তার বেশ জ্ঞান থাকত। সংগীরা ভাবত, এ আবার কি রোগ হল! ডাক্তার এসেও রোগ ধরতে পারেন না। সাধকরা বলেন, এর নাম সমাধি। সমাধি কাকে বলে তা আগেই জেনেছ।

পড়ার বয়স হলে তাঁকে একটা খৃস্টান পাদরীদের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হল। পাদরীদের স্কুলে পড়লে সকলকেই বাইবেল পড়তে হয়। বাইবেল হল খৃস্টানদের ধর্মপুস্তক। যোগেনের বাইবেল পড়তে ভালই লাগত, তবে তার চেয়ে তাঁর বেশী ভাল লাগত রামায়ণ-মহাভারতের গল্প পড়তে।

যোগেনের বাবা নবীনচন্দ্র দাক্ষিণেশ্বরে ফুল তুলতে যেতেন, একথা আগেই বলেছি। যেদিন নবীনবাবু ফুল তুলতে যেতে পারতেন না, সেদিন তিনি যোগেনকে ফুল আনার জন্তে পাঠাতেন।

যোগেন একদিন ফুল তুলতে গিয়ে দেখেন একটা ঘরে অনেক লোক বসে আছে আর একজন লোক কি সব উপদেশ দিচ্ছেন। তাঁর ইচ্ছা হল লোকটি কি কথা বলেন শুনতে। দরজার নিকটে দাঁড়িয়ে তিনি শুনতে লাগলেন।

—ভারী সুন্দর সুন্দর কথা তো বলেন দেখছি! এ লোকটি কে?

পরে জানতে পারলেন তিনি হলেন রামকৃষ্ণদেব।

যোগেন এতদিন শুনেছিলেন রামকৃষ্ণদেব একটা পাগল। কিন্তু আজ তাঁর কথা শুনে তিনি বুঝতে পারলেন, এ পাগল নয়। তবে লোকে এঁকে পাগল

বলে কেন? লোকে তাঁকে বুঝতে পারে না, তাই বোধ হয় একথা বলে।

তারপর থেকে যোগেন মাঝে মাঝে রামকৃষ্ণদেবের কাছে আসেন। রামকৃষ্ণদেবও আদর করে কত কি খেতে দেন। তিনি মুগ্ধ হয়ে যান রামকৃষ্ণের ভালবাসা পেয়ে।

রামকৃষ্ণদেব সুন্দর সুন্দর গল্প বলে উপদেশ দিতেন। যোগেনকে তিনি কি ভাবে উপদেশ দিতেন, এখানে একটু উল্লেখ করছি।

যোগেন ছিলেন নিরীহ, সাদাসিদে ভাল মানুষ। তাঁকে কেউ কোন কটু কথা বললেও কিছু না বলে চুপ করে থাকতেন।

একবার একটা কড়া আনার জন্যে রামকৃষ্ণদেব তাঁকে বাজারে পাঠান। যোগেন বাজার থেকে একটি কড়া নিয়ে ফিরে আসেন। তাঁর হাতে কড়াটি দিতেই তিনি দেখলেন এটি ফাটা।

রামকৃষ্ণদেব তখন তাঁকে বললেন, হ্যাঁরে, তুই কি রকম বোকা ছেলে বল দেখি? কড়াটা না দেখে নিয়ে এলি? তোকে যে ঠকিয়ে দিলে? সাধু হবি বলে বোকা হবি কেন? দোকানদার তো আর সাধু হতে বসেনি যে তোর সরল কথায় বিশ্বাস করে ভাল জিনিস দিয়ে দেবে।

যোগেন বলেন, দোকানদার ভগবানের দিব্যি দিলে এবং বললে এটি ভাল, তবে তো আনলুম। ভগবানের নাম করে যে কেউ মিথ্যে কথা বলতে পারে, তা তো জানতুম না।

—বাজারে যখন কোন জিনিস কিনতে যাবি, তখন পাঁচ দোকান ঘুরে তার দাম যাচাই করবি। জিনিসটি নেবার সময় ভাল করে পরীক্ষা করে দেখবি যাতে দোকানদার খারাপ জিনিস না দিয়ে দেয়। আর যে সব জিনিসের ফাউ পাওয়া যায়, তার ফাউটি পর্যন্ত চেয়ে আনবি।

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ

আমেরিকার এক বিরাট জনসভায় দাঁড়িয়ে বাংলা মায়ের এক তরুণ সন্তান বক্তৃতা করছেন। বক্তৃতার বিষয় হল ভারতের ধর্ম। বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে জনসমাজ পলকহীন চোখে চেয়ে রয়েছে সেই তরুণ সন্ন্যাসীর মুখের দিকে।

বিরামহীনভাবে তিনি বক্তৃতা করেই যাচ্ছিলেন। এমন সময় সভার মধ্যে হঠাৎ এক বিকট শব্দ হল। চারিদিকে হইচই পড়ে গেল। সকলের মুখে ফেরে, সভায় বোমা পড়েছে।

বোমার নাম শুনেই লোকজন যে যেদিকে পারলে ছুটে পালাল। বোমার আঘাতে ঐ নবীন সন্ন্যাসী আহত হলেন। যে ছেলেটি বোমা ছুঁড়ে মারে, তার গায়েও বোমার আঘাত লাগল এবং সে সংগে সংগেই মারা গেল।

আহত সন্ন্যাসীদের নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করানো হল। পনের দিন পরে তিনিও এ জগত থেকে বিদায় নিলেন।

এভাবে ভারতের কথা ভারতের ধর্ম বিদেশে প্রচার করতে গিয়ে যিনি নিজের প্রাণ বিসর্জন দিলেন তাঁর নাম স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। তাঁর কথাই এখন তোমাদের কাছে বলব।

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ রামকৃষ্ণদেবেরই একজন শিষ্য। বিবেকানন্দের সহকর্মী। বাল্যে তাঁর নাম ছিল সারদাপ্রসন্ন মিত্র।

খুব বেশী দূরে যেতে হবে না। অতি নিকটেই পইহাটী গ্রাম। কলকাতারই কাছে। ২৪ পরগণা জেলায় তাঁর অবস্থান। এই পইহাটীর নওরা পল্লীতে আমাদের ত্রিগুণাতীতানন্দ স্বামীজী জন্মেছিলেন।

সারদাপ্রসন্নের দাদামশাই নীলকমল সরকার পইহাটীর জমিদার

ছিলেন। তখনকার দিনে জমিদারদের সকলেই ভাল করে জানত। কারণ বড়লোকদের মধ্যে তাঁদের হাক ডাক হ'ত বেশী। সারদার দাদুর নামও অনেকেরই জানা ছিল অর্থাৎ সে অঞ্চলের তিনি একজন নাম-করা লোক ছিলেন।

সারদাপ্রসন্নের দাদুকে চিনলে, এবার তাঁর বাবার কথা কিছু বলি। শিবকৃষ্ণ মিত্র হলেন সারদাপ্রসন্নের বাবা। শিবকৃষ্ণ বাবু খুব ভাল ও পরম ধার্মিক লোক। গাঁয়ের সকলেই তাঁকে খুব ভালবাসত ও শ্রদ্ধা করত।

সারদাপ্রসন্ন পাড়াগাঁয়ে জন্মেছিলেন। গাঁয়ের লোকেরা সাধারণত সরল প্রকৃতির হয়। আমাদের সারদাপ্রসন্নও খুব সাদাসিদে গোছের ভাল মানুষ ছিলেন।

গাঁয়ে তাঁকে বেশী দিন থাকতে হয় নি। তিনি কিছুদিন পর কলকাতা শহরে চলে আসেন। কলকাতায় আসার পর তাঁর বাবা তাঁকে একটা স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন।

সারদাপ্রসন্ন স্কুলে এসে অল্পদিনের মধ্যে খুব নাম করে ফেলেন। পরীক্ষাতে সকলের ওপরে তাঁর স্থান থাকে। তাঁর স্বভাব ছিল খুব শান্ত, এ কথা তোমরা আগেই জেনেছ। স্কুলে ছাত্র ও শিক্ষক সকলেই তাঁর ব্যবহারে সন্তুষ্ট। তাই সবাই তাঁকে ভালবাসেন ও আদর করেন।

ক্লাসের ভাল ছেলেদের শিক্ষক মশাইরা বেশী ভালবাসেন, এ তোমরা নিশ্চয় জান। এই স্নেহের বিনিময়ে সে-সব ছাত্র অন্যান্য ছাত্রদের চাইতে অনেক বেশী শেখার সুযোগ পায়। সারদাপ্রসন্নের সে সৌভাগ্য হয়েছিল।

একটির পর একটি বছর চলে যায়, আর সারদাও এক ক্লাস থেকে আর এক ক্লাসে ওঠেন। এভাবে দেখতে দেখতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষার বছর এসে গেল।

সারদা পড়াশোনায় ভাল ছিলেন তা তোমরা শুনেছ। সকলেই মনে করলে, সারদা এনট্রান্স পরীক্ষায় যে ভালভাবে পাশ করবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, বৃত্তিও পাবেন।

কিন্তু ভাগ্য যদি মন্দ থাকে তবে কিছুতেই কিছু হয় না। এত আশা ভরসার মূলে আঘাত করলে পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে তাঁর সোনার ঘড়ি হারিয়ে গিয়ে। এই ঘড়িটি তাঁর বড় শখের ছিল। সাধের ঘড়িটি হারিয়ে তাঁর মন খুব খারাপ হয়ে যায়। তিনি দিনরাত ঘড়ির চিন্তা করতে করতে অস্থির হয়ে পড়েন। এর ফলে পরীক্ষা আর ভাল দেওয়া হল না।

তারপর পরীক্ষার ফল বের হলে দেখা গেল তিনি কোন প্রকারে দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেছেন।

যাঁর আশা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবেন, তিনি কিনা দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করলেন! এ অপমান তাঁর কাছে যেন বজ্রাঘাতের মত মনে হতে লাগল।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত সারদাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট নিয়ে গেলেন।

মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের কথা তোমরা আগেই জেনেছ। তিনি সারদাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন।

রামকৃষ্ণদেবের কাছে যেতেই তিনি তাঁকে আদর করে সান্ত্বনা দিয়ে কাছে বসিয়ে বললেন, সোনার ঘড়ি চুরি হওয়াতে তোমার মনে খুব দুঃখ হয়েছে না? যে জিনিস হাতছাড়া হয়ে গেছে, দুঃখ করে তো আর তা ফিরে পাবে না। বৃথা কেন ওর জন্যে চিন্তা করে মন খারাপ করছ? এ সব তো সামান্য ব্যাপার। ঐ রকম কত লোকের কত জিনিস হারায়! তাতে মন খারাপ করে কি লাভ বল তো। এসব ভুলে যাও। তোমার সামনে আরও কত বড় কাজ পড়ে রয়েছে। ওঠ, তার জন্য প্রস্তুত হও!

রামকৃষ্ণের কাছে সান্ত্বনা বাণী পেয়ে সারদাপ্রসন্নের নতুন জীবনের সূচনা হল। তাঁর জীবনে পরিবর্তন দেখা দিল।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে তিনি মেট্রোপলিটন কলেজে পড়তে আরম্ভ করেন। কলেজের পড়াশোনা বেশ ভাল ভাবেই হতে লাগল। সেখানেও পড়াশোনায় বেশ সুনাম অর্জন করেন।

কিছুদিন পর তিনি রামকৃষ্ণদেবের নিকট যেতে আরম্ভ করেন। রামকৃষ্ণদেবের নিকট যাতায়াত করতে করতে সংসার তাঁর কাছে অসার মনে হতে লাগল। সংসারে কোন সুখ নেই, বরং দুঃখ বেড়েই চলে, তিনি তা বুঝতে পারলেন।

সংসারের প্রতি উদাস ভাব দেখে বাবা তাঁকে বিয়ে দেবার ইচ্ছে করলেন। বিয়ের নাম শুনেই সারদার মন খারাপ হয়ে গেল। তিনি একদিন কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেন।

সারদাপ্রসন্ন হাঁটতে হাঁটতে পাঁশকুড়া এসে পৌছলেন। সেখান থেকে আবার হাঁটতে আরম্ভ করলেন। ক্রমে এসে একটা গভীর জংগলে পড়লেন। তারপর সন্ধ্যে হয়ে গেল।

জংগল তো জংগলই। ঘন বন। মানুষ বা মানুষের বাসস্থানের কোন চিহ্নই সেখানে দেখতে পাওয়া গেল না। সারদাপ্রসন্ন পড়লেন মহা ভাবনায়। তাঁর ভাবনা হল কোথায় রাত কাটাবেন।

বনে থাকে হিংস্র জন্তু—বাঘ, ভাল্লুক, সাপ, আরও কত কি। তারা কখন কি বিপদ ঘটায় বলা যায় না।

মানুষের সন্ধান খুঁজতে খুঁজতে তিনি এসে গভীর বনে ঢুকলেন। এদিকে রাতও বাড়তে লাগল। কোন আশ্রয়স্থান না পেয়ে অবশেষে গাছে উঠে রাত কাটাবেন ঠিক করলেন। তিনি উঠলেন একটা গাছে।

যে গাছে তিনি উঠেছেন সে গাছটি বড় ও মোটা। তারই একটা ডালে তিনি শুয়ে পড়লেন রাত কাটাবেন বলে।

দু দিন কিছু খাওয়া হয় নি, তাতে আবার পথশ্রমে তাঁকে খুবই কাহিল করে তুলল। শোয়ার সংগে সংগেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঘুটঘুটে নিশুতি রাত। কৃষ্ণপক্ষের আঁধারে দু হাত দূরের জিনিস পর্যন্ত কিছুই দেখা যায় না। পেঁচা আর ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকে গভীর বনের নিস্তব্ধতা ভংগ করছিল। এমন সময় সারদাপ্রসন্ন ঘুম থেকে চমকে ওঠেন এবং চোখ খুলে দেখেন, সামনে একজন বিরাট মহাপুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন।

লোকটির বড় বড় গোঁফ দাড়ি। দেখলে মনে হয় তার অনেক বয়স হয়েছে। মাথার সব চুলেই সাদা রঙ ধরে গেছে। মুখখানা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণে জল জল করছে।

—তোমার বড্ড খিদে পেয়েছে না? এই নাও বাতাসা ও এক ঘটি জল। এটি খেয়ে পেট ঠাণ্ডা কর। এই বলে লোকটি কিছু বাতাসা ও জল তাঁকে গাছের ওপরে দিয়েই কোথায় চলে গেলেন।

পরদিন ভোর হলে তিনি সেই লোকটির খোঁজ করতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও তাঁর সন্ধান পেলেন না।

তারপর আবার হাঁটতে আরম্ভ করলেন। এভাবে হাঁটতে হাঁটতে তিনি পুরী এসে পৌছলেন।

এদিকে শিবকৃষ্ণবাবু তাঁর সন্ধান করতে করতে পুরী এসে হাজির হলেন। পুরী এসে তাঁরা সারদার খোঁজে সব মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একদিন রাস্তায় মাতাপিতার সংগে সন্তানের দেখা হয়ে গেল।

মা-বাবা ছেলের জন্যে কতদূর ভাবেন, তা বোধ হয় কাউকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন করে না। বাবার চেয়ে মায়ের দুঃখ হয় আবার বেশী।

এতদিন সারদাপ্রসন্নের সন্ধান না পেয়ে শিবকৃষ্ণবাবু ও তাঁর স্ত্রী পাগলের মত ছুটোছুটি করেছেন। আজ হঠাৎ রাস্তায় সেই হারানিধি ছেলেকে চোখের সামনে দেখতে পেয়ে মা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। তিনি আনন্দের অতিশয্যে অজ্ঞান হয়ে পড়েন।

জ্ঞান হলে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে মা কাঁদতে কাঁদতে বলেন, এমনি করে আমাদের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে আসতে তোর কি প্রাণে লাগে না বাবা?

ছেলে কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে।

পুরী থেকে ফিরে এসে সারদাপ্রসন্ন পুনরায় কলেজে পড়তে আরম্ভ করেন।

রামকৃষ্ণদেব দেহত্যাগ করার পর তিনি বরানগর মঠে যোগদান করেন।

একদিন বরানগর মঠে হইচই পড়ে গেল, স্বামী ত্রিগুণাতীতকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কাউকে কিছু না বলে তিনি পালিয়েছেন।

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ চলেছেন ভারতের তীর্থ দর্শনে। দিনের পর দিন একটার পর একটা দেশ তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ঘুরতে ঘুরতে এক বার এক জায়গায় ভীষণ ঝড়ের মুখে পড়েছিলেন।

পায়ে হেঁটে চলেছেন পরিব্রাজকের বেশে আমাদের সারদা মহারাজ। যে দিনের কথা বলছি সেদিন ছিল কৃষ্ণপক্ষের গাঢ় অন্ধকারের পথ। কালো মেঘ এসে আকাশ জুড়ে বসেছে। কিছুক্ষণ পরে নামল মুষলধারে বৃষ্টি।

সারদা মহারাজ পড়লেন বিপদে। কোথায় যাবেন কি করবেন কিছুই ঠিক করতে না পেরে, সংগে যে কম্বলটা ছিল তাই গায়ে দিয়ে রাস্তার ওপর শুয়ে পড়লেন।

তিনি যেখানে শুয়েছেন তার খুব কাছেই রেল-স্টেশন ছিল। কিন্তু

অন্ধকারের জন্য তিনি তা কিছুই দেখতে পান নি। বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে তিনি মড়ার মত পড়ে আছেন, এমন সময় লণ্ঠন হাতে একজন প্রহরী স্টেশন থেকে এ রাস্তার দিকে আসছিল। রাস্তায় এভাবে একজন সাধুকে পড়ে থাকতে দেখে প্রহরী তাঁকে বাড়িতে নিয়ে গেল।

পাহাড়ে পর্বতে ও বনে বনে যাঁরা ঘুরে বেড়ান তাঁদের নানা বাধা বিপত্তি ও বিপদের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

একবার এভাবে ঘুরতে ঘুরতে তিনি পাহাড়ের একটা গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন।

সে গ্রামে একটা জীর্ণ মন্দির ছিল। মন্দিরটি খুবই পুরানো। দিনের বেলায় পূজারী পূজো করে চলে যান। আবার সন্ধ্যে হলেই মন্দির বন্ধ করে দেওয়া হয়।

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ এসেছেন মন্দির দর্শনে। এদিকে বেলা পড়ে গেল। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। তাঁর চিন্তা হল রাতটা কাটাবেন কোথায়?

অবশেষে এই মন্দিরে রাত কাটাবেন বলে মনস্থ করলেন। মন্দিরে থাকতে চাইলে গ্রামবাসীরা বাধা দিলে। তারা বললে, দেখুন সন্ন্যাসী ঠাকুর, এ মন্দিরে থাকবেন না। এ মন্দিরে খুব মশার উপদ্রব হয়। সন্ধ্যে হলে কোথা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মশা এসে জড় হয়। মন্দিরের ভেতর কেউ থাকলে তাঁকে কামড়িয়ে মেরে ফেলে। মশার কামড়ে এখানে অনেক সাধু সন্ন্যাসীর প্রাণ গেছে। সেজন্য সন্ধ্যে হবার আগেই মন্দির বন্ধ করে দেওয়া হয়।

স্বামীজী একথা শুনে আশ্চর্য হলেন। মশায় কামড়ালে সাধারণত ম্যালেরিয়া রোগ হয়। কিন্তু মশার কামড়ে মানুষ মরে এমন অদ্ভুত কথা

তো কখনই শোনা যায় নি। গ্রামবাসীরা যা বলছে সত্যি কিনা জানবার জন্য তিনি মন্দিরে থাকার জন্যে আরও বেশী আগ্রহান্বিত হলেন।

গ্রামবাসীদের জানালেন মন্দিরেই তিনি রাত কাটাবেন। তারাও তাঁকে মন্দিরে রেখে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল।

ত্রিগুণাতীতানন্দ মন্দিরে বসে আছেন। পরক্ষণে সন্ধ্যে নেমে এল। সন্ধ্যে হবার সংগে সংগে পংগপালের মত ঝাঁকে ঝাঁকে মশা এসে তাঁকে ঘিরে ফেললে। মশার ঝাঁককে দেখলে মনে হয় যেন এক একটা কালো মেঘ। চারদিক থেকে ভীষণভাবে তাঁকে আক্রমণ করলে। তিনি মশার কামড়ের জ্বালায় অস্থির হয়ে ছট্ ফট্ করতে করতে এপাশ থেকে ওপাশে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। তবু নিস্তার নেই, মশার আক্রমণ বেড়েই চলে। তিনি বুঝলেন আর রক্ষে নেই, মৃত্যু নিশ্চিত।

দেখতে দেখতে রাতের আঁধার সরে গেল। ভোরের আলো পূর্বাকাশে ছোট্ট শিশুর মত হেসে উঠল। গ্রামবাসীরা দলে দলে দেখতে এল সাধু জীবিত কি মৃত।

মন্দিরের দরজা খুলতেই গ্রামবাসীদের চমক লাগিয়ে দিয়ে তিনি তাঁদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। গ্রামবাসীরা অবাক হয়ে জিগগেস করে, কি করে তিনি বেঁচে রইলেন।

—ভগবান যাঁকে রক্ষে করেন, তাঁর মৃত্যু কখনও হতে পারে না। আমার গুরু রামকৃষ্ণদেব ছায়ার মত আমায় রক্ষে করেছেন। ভগবানের ওপরে যাঁদের বিশ্বাস আছে, তাঁরা এ ভাবেই রক্ষা পান।

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ

জোয়ারের টানে সমুদ্রের জল এসে কানায় কানায় ভরে উঠেছে গঙ্গা। নদী ভরা জল টলমল টলমল। নদীর বুক চিরে চলেছে একটি নৌকো।

নৌকোতে বহু লোক। যাত্রীদের মধ্যে নিরঞ্জনও রয়েছেন। তাঁর চেহারা বেশ মোটা-সোটা। রাঙা টুকটুকে তাঁর গায়ের রঙ। সুন্দর কোঁকড়ানো ছিল তাঁর মাথার চুল। ভারী চমৎকার ছিল তাঁর চেহারা।

নৌকোর যাত্রীদের মধ্য থেকে একজন নিরঞ্জনকে জিগগেস করলে, আপনি কোথায় যাবেন ?

—দক্ষিণেশ্বরে যাব।

—দক্ষিণেশ্বরে কেন যাবেন মশাই ?

—সেখানে আমার গুরু রামকৃষ্ণদেব থাকেন, তাঁকে দেখতে যাব।

—রামকৃষ্ণদেব তো মস্ত পাগল। ওকে দেখে কি হবে বলুন তো ?

—দেখুন আমার গুরুর নিন্দে করবেন না। জানেন, গুরুনিন্দে শোনা পাপ। আপনারা যদি তা করেন তবে ভাল হবে না বলছি।

নৌকোর যাত্রীদের মধ্যে ভাল লোক ছিল সত্য, কিন্তু কতকগুলো লোক বড্ড খারাপ ছিল। তাদের কাজই হল মানুষের দোষ খুঁজে বেড়ানো। তারা নিরঞ্জনের কথা শুনে আরো বেশী করে রামকৃষ্ণদেবের নিন্দে করতে লাগল।

নিরঞ্জন খুব ছোটবেলা থেকেই একটা ব্যায়ামের ক্লাবে যেতেন এবং সেখানে রোজ ব্যায়াম করতেন। তিনি ভালো কুস্তি লড়তে পারতেন। কাজেই তোমরা অনুমান করে নিতে পার তাঁর শরীরে বেশ শক্তি ছিল। যাঁরা শক্তিমান পুরুষ তাঁরা কোন দিন কোন অন্যায়কে সহ্য করতে পারেন না।

নৌকোর লোকেরা অন্যায় ভাবে তাঁর গুরুর নিন্দে করছিল বলে নিরঞ্জন তা আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি তখন রেগে নদীতে নৌকো ডুবিয়ে দিতে চাইলেন।

নৌকো তখন গঙ্গার মাঝখানে ছিল। এখানে নৌকো ডুবলে সকলকে গভীর জলে ডুবে মরতে হবে। যাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন সাঁতার জানলেও অনেকেই সাঁতার জানতেন না। নিরঞ্জন রেগে নৌকো ডুবাতে চাইলেন, ভয়ে সকলে চেঁচাতে লাগল। নৌকোর মধ্যে হই-চই পড়ে গেল এবং খুব বিশৃংখলা দেখা দিল। যারা রামকৃষ্ণদেবের নিন্দে করছিল তারা ভাবলে এ তো বড় বিপদ করলে দেখছি। এ যেমন নাছোড়-বান্দা, আমাদের কখনও ছাড়বে বলে মনে হয় না। তখন ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলে। ক্ষমা চাওয়ার পর তিনিও চুপ করে গেলেন।

দেখতে দেখতে নৌকো দক্ষিণেশ্বরে এসে নোঙর করলে। যাত্রীরা যে যার পথে চলে গেল, নিরঞ্জন এলেন তাঁর গুরুর কাছে।

নৌকোতে যে সব ঘটনা হয়েছিল সব তিনি রামকৃষ্ণদেবকে বললেন।

রামকৃষ্ণদেব তাঁর সব কথা মন দিয়ে শুনলেন। তিনি যখন শুনলেন নিরঞ্জন নৌকো ডুবাতে চেয়েছিল তখন তিনি বলেন, নিরঞ্জন, একি করছিলি বল দেখি? নৌকোতে তো অনেক লোক ছিল। সকলে তো আর নিন্দে করে নি, একজনের অপরাধে তুই সকলকে শাস্তি দিতে চাইছিলি? আর মাঝি বেচারা গরিব লোক। তার নৌকো ডুবিয়ে দিলে সে কী বিপদে পড়ত বল দেখি? সে সারাদিন নৌকো চালিয়ে দুটি পয়সা রোজগার করে। তাতেই তার সংসার চলে। নৌকো ডুবালে এ গরিব লোকটিকে না খেয়ে মরতে হত। রাগ করে কখনও যা তা করতে যাবি নে। আর কখনও এমন কাজ করিস নে।

নিরঞ্জন এতক্ষণ গুরুর কথা সব ভাল করে শুনছিলেন, এখন তিনি বেশ বুঝতে পারলেন রাগ করে হঠাৎ কোন কাজ করা কত অন্যায়।

যে নিরঞ্জনের কথা এতক্ষণ তোমরা শুনলে তিনি পরে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। তিনিই স্বামী নিরঞ্জনানন্দ। এখন তাঁর কথা তোমাদের কিছু বলব।

স্বামী নিরঞ্জনানন্দের ছোটবেলার নাম নিত্যনিরঞ্জন। চব্বিশ পরগণা জেলার রাজার হাট বিষ্ণুপুরে ছিল তাঁর বাড়ি।

সে সময় কলকাতার আহিরীটোলাতে একটি দল ছিল। দলের সভ্যদের কাজ ছিল ভূতকে ডেকে এনে তাদের সংগে কথা বলা। তোমরা হয় তো ভাবছ ভূতকে আবার ডেকে আনে কি করে।

কতকগুলো ভৌতিক ক্রিয়া দ্বারা প্রেতাত্মাকে ডেকে আনা যায় এবং তাদের সংগে কথা বলা যায়। এ আজকাল অনেকেই করে থাকে। এ কাজ এমন কোন বিশেষ শক্তির কাজ নয়। দলের লোকেরা ভূতের খেলা নিয়ে দিনরাত মেতে থাকত। তাদের আর অন্য কোন কাজ ছিল না। তাই সকলেই এই দলকে বলত ভূতুড়ে দল। এই ভূতুড়ে দলে নিত্যনিরঞ্জনও সভ্য ছিলেন।

রামকৃষ্ণদেব জানতে পারলেন নিরঞ্জন ভূতের দলে মিশে প্রায় সব সময় ভূত নিয়েই মেতে থাকে। একদিন তিনি তাঁকে বলেন, দেখ, যে সব সময় ভূত ভূত করে, সে ভূতই হয়ে যায়। ঈশ্বরের কথা ভাবতে ভাবতে মানুষ আবার ভগবান হতে পারে। এখন বল দেখি কোন্‌টা হওয়া ভাল?

নিরঞ্জন জবাব দিলেন, ভগবান হওয়াই ভাল।

তারপর থেকে তিনি আর ভূতের দলের সংগে মিশতেন না। সময় পেলেই রামকৃষ্ণদেবের নিকট আসতেন এবং নানা বিষয় শিক্ষা করতেন।

রামকৃষ্ণদেব বলতেন, আমার নিরঞ্জনের একটুও অঞ্জন নেই। অঞ্জন মানে কি জান? অঞ্জন হল ময়লা। অঞ্জন না থাকার কথা তিনি কেন বলেছেন বুঝলে? নিরঞ্জনের ভেতর একটুও ময়লা নেই—তাঁর সবটাই পবিত্র, অর্থাৎ তিনি সম্পূর্ণ শুদ্ধ।

যখন বরানগর মঠে সন্ন্যাস হয় তখন ঘটনাটি মনে করে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর নাম রেখেছিলেন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ।

আমি চাই এমন লোক—যাদের শরীরের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাত নির্মিত হবে, আর তাদের শরীরের ভেতর এমন একটি মন বাস করবে, যা বজ্রের উপাদানে হবে গঠিত। —**স্বামী বিবেকানন্দ**

স্বামী তুরীয়ানন্দ

সারা পিঠ জুড়ে কারবাংকল হয়েছে। কারবাংকল কি জান? মৌমাছির চাক দেখেছ তো? মৌমাছির চাকের মত সারা পিঠে ঘা হয়। চাকে যেমন খোপে খোপে গর্ত থাকে, পিঠেও সেরূপ গর্ত হয়। মৌমাছির চাকে খোপে খোপে যেমন মধু থাকে, কারবাংকলের গর্তও সেরূপ পুঁজে ভরে থাকে। এসমস্ত পুঁজকে অপারেশন করে বার করতে হয়।

স্বামী তুরীয়ানন্দেরও একবার এ রকম কারবাংকল হয়েছিল। ডাক্তার দেখতে এসে বললেন, এখুনি অপারেশন করতে হবে।

শক্ত রোগের অপারেশন করার আগে ডাক্তাররা রোগীকে অজ্ঞান করে নেন। অজ্ঞান না করলে রোগী খুব কষ্ট পায়। কষ্ট সইতে না পেরে ভীষণ চিৎকার ও ছটফট করে। তাতে অপারেশন গোলমাল হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্যে অপারেশনের আগে অজ্ঞান করার প্রয়োজন হয়।

স্বামী তুরীয়ানন্দকে ডাক্তার অজ্ঞান করতে চাইলে তিনি বললেন, অজ্ঞান করার দরকার হবে না। আপনারা আমাকে কিছুক্ষণ সময় দিন, তারপর অপারেশন করুন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ তখন কি করলেন জান? তিনি কিছু সময় চোখ বুঁজে চুপ করে রইলেন। অল্পক্ষণ পরে চোখ খুলে ডাক্তারের দিকে একবার তাকালেন এবং অপারেশন করতে বললেন।

ডাক্তার একখানি ধারালো ছুরি নিয়ে পিঠে গভীর গর্ত করে অনেক গুলো কাটাকুটি করলেন। স্বামীজী কোন কথা না বলে চুপ করে রইলেন। এত বড় সাংঘাতিক অপারেশন তিনি নীরবে সয়ে যেতে লাগলেন। একটু উঃ আঃ করা দূরে থাক, মুখে কোন দুঃখের চিহ্নও

দেখতে পাওয়া গেল না। ডাক্তাররা অবাক হয়ে যান আর ভাবেন, এ কি করে সম্ভব হল ?

তোমরা হয়তো ভাবছ, একি সম্ভব ? অত বড় ছুরি শরীরে ঢোকোনো হল অথচ তিনি মোটেই টের পেলেন না !

আশ্চর্য হবার কথাই বটে। এসব তো কখনো শোনা যায় না। তাই আমাদের কাছে অদ্ভুতই ঠেকে।

যোগী মহাপুরুষদের কারো কারো অদ্ভুত সব ক্ষমতা থাকে। তাঁরা মনটাকে শরীর থেকে সরিয়ে নিতে পারেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দের শরীরে যখন অপারেশন করা হচ্ছিল, তখন মনকে শরীর থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। মনই তো সব। শরীর থেকে মনটি তুলে নিলে শরীরে কোন আঘাত করলে মোটেই টের পাওয়া যায় না। তিনিও শরীর থেকে মনটি তুলে নিয়েছিলেন বলেই অপারেশন করার সময় কোন প্রকার শব্দ না করে সব সহ্য করতে পেরেছিলেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দের পরিচয় তোমরা নিশ্চয়ই জানতে চাইবে। তাঁর ছোট বেলাকার নাম হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়। ডাক নাম হরি। বাগবাজারের বোসপাড়ায় ছিল তাঁর বাড়ি।

১৮৬৩ সালের ৩রা জানুয়ারী আমাদের হরিনাথ এই মাটির পৃথিবীতে পা দিয়েছিলেন। ছেলেবেলায় মায়ের কোলের আদর যত্নের পালা শেষ হতে না হতেই হরিনাথের মা ও বাবা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।

এ বয়সে মা বাবাকে হারালে সন্তানের দুঃখের সীমা থাকে না। সারা জীবন তাদের দুঃখ পেতে হয়। কারণ মা বাবার মত আদর যত্ন তো আর কেউ করতে পারে না। অপরে যতই ভালবাসুক না কেন, মা বাবার ভালবাসার কাছে তার তুলনা হয় না। হরিনাথও শৈশবে মা বাবাকে হারিয়ে অনেক দুঃখ পেয়েছিলেন।

হরিনাথের স্কুলে পড়ার বয়স হলে তাঁকে একটা স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয়। হরিনাথ স্কুলে যান আর বাড়ি এসে মন দিয়ে পড়াশুনা করেন। কিন্তু মাঝে মাঝে মায়ের জন্যে তাঁর মন কেমন করত। নির্জনে বসে বসে তিনি কাঁদতেন আর মার কথা ভাবতেন।

এভাবে কিছুদিন যাবার পর আর একটু বড় হলে তিনি ঠাকুর দেবতার পূজো আর জপ নিয়ে আনন্দে মেতে থাকতেন।

যাঁরা ধর্মের নিয়ম কানুন বেশী মেনে চলেন, তাঁদের বলা হয় নিষ্ঠাবান। হরিনাথও খুব নিষ্ঠাবান ছিলেন। তিনি নিজে রান্না করে খেতেন এবং গীতা, উপনিষদ্ প্রভৃতি ধর্মের বই রোজ নিয়ম করে পড়তেন। তাঁর আর একটি নিয়ম ছিল প্রত্যহ গঙ্গায় চান করা। গঙ্গায় চান করতে গিয়ে একদিন তিনি কুমীরের মুখে পড়েছিলেন।

গঙ্গাতে ছেলে, বুড়ো, জোয়ান কত লোক চান করে। সেদিন একদল ছেলে মহা হুল্লোটি করে চান করতে আরম্ভ করেছিল। হরিনাথও চান করতে এসেছিলেন। চান করতে যেই ডুব দেবেন এমনি সময় একটি কুমীর জলে ভেসে ওঠে। কুমীর কুমীর, শিগগির পালা, পালা, বলতে বলতে ছেলের দল তড়াক করে জল থেকে সব ডাঙায় উঠে পড়ল। কিন্তু হরিনাথ উঠলেন না। ভয় না করে তিনি জলে দাঁড়িয়ে রইলেন। ছেলের দল চিৎকার করে বলতে লাগল, ওরে হরি, ওঠে আয়। কুমীরে তোকে খেল'। শিগগির পালিয়ে আয়।

হরিনাথ তবু উঠে আসলেন না। তিনি মনে মনে ভাবলেন, গীতায় পড়েছেন আত্মা কখনো মরে না। আত্মার বিনাশ হয় না, তবে ভয় পাব কেন? কুমীর আমাকে খেলে আমার শরীরটা নষ্ট হতে পারে, তাই বলে আমার তো কিছু ক্ষতি করতে পারবে না।

তোমরা হয়তো ভাবছ, এ কি রকম কথা। মানুষ আবার মরে না কি

করে ? রোজই তো কত মানুষকে মরতে দেখি। মরা মানে কি জান ? শরীর নষ্ট হওয়া। কাপড় পুরনো হলে আমরা যেমন পুরনো কাপড়টি ছেড়ে নতুন কাপড় পরি, সেরূপ মানুষের শরীরটা পুরনো হলে তাকে ছেড়ে দিয়ে মানুষ আবার নতুন শরীরে যায়। এই যে শরীর বদল করা হল, এরই নাম মৃত্যু।

আমাদের শাস্ত্র গীতায় এসব কথা আছে। হরিনাথ খুব গীতা পড়তেন কি না! গীতা পড়ে সত্যি সত্যি গীতার উপদেশগুলো তিনি কাজে লাগাতে পারছেন কি না, সেদিন হরিনাথ তাই পরীক্ষা করলেন।

কুমীরটা জলে ভেসে উঠে ছুটতে ছুটতে হরিনাথের দিকে এল। কিন্তু আশ্চর্য, তাঁর কাছে এসে কিছু না করে গা ঘেঁসে চলে গেল। ছেলে বুড়ো যারা ডাঙায় দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছিল, তারা অবাক হয়ে গেল হরিনাথের আর কুমীরের কাণ্ড দেখে।

হরিনাথের পাড়ায় দীনবন্ধু বসু থাকতেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতেন। একদিন রামকৃষ্ণদেব তাঁর বাড়িতে এলেন। হরিনাথ শুনলেন পাশের বাড়িতে একজন বড় সাধু আসবেন। বড় সাধু দেখবার জন্যে দীনবন্ধুর বাড়িতে লোকের ভীড় জমে গেছে। তিনিও সাধু দেখবার জন্যে ব্যাকুল হলেন। তিনি দীনবন্ধুর বাড়ি এসে বসে রইলেন।

যথাসময়ে রামকৃষ্ণদেব দীনবন্ধুর বাড়ি এসে উপস্থিত হলেন। যাঁরা বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন, সকলেই রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করেন। হরিনাথও তাঁকে দেখলেন। এত লোকের মধ্যে রামকৃষ্ণদেবও হরিনাথের দিকে চেয়ে দেখলেন। হরিনাথও তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যান।

রামকৃষ্ণদেব চলে গেলেন। যাঁকে দেখে আনন্দ পাওয়া যায়, তাঁকে

একবার দেখে কখনো মনের আশা মেটে না। তাঁকে আবার কবে দেখব, এই নিয়ে চলে মনের মাঝে মহা তোলপাড়।

রামকৃষ্ণদেবকে হরিনাথের ভাল লেগেছে। তাঁকে আবার দেখবার জন্যে তিনি ব্যাকুল হলেন। তিনি খবর নিয়ে জানতে পারলেন রামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরে থাকেন।

কিছুদিন পর হঠাৎ একদিন হরিনাথ দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণদেবের নিকট উপস্থিত হলেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁকে কাছে বসিয়ে অনেক গল্প বললেন, গল্প শুনে হরিনাথের খুব ভাল লাগল। এর পর থেকে প্রায়ই তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসতেন। এভাবে আসতে আসতে রামকৃষ্ণদেবের সংগে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠতা হয়ে যায়।

রামকৃষ্ণদেবের শরীর যাবার পর বরানগরে মঠ স্থাপন করে তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যেরা সেখানে বাস করতে লাগলেন। এ কথা তোমাদের আগেও অনেকবার বলেছি। বরানগর মঠে হরিনাথ এসে যোগদান করলেন। সেখানে সকলের সংগে তিনি সন্ন্যাস নিলেন, সন্ন্যাসের সময় তাঁর নাম হল স্বামী তুরীয়ানন্দ।

সন্ন্যাসীরা কোন বাঁধনের মাঝে থাকতে চান না। তাঁরা এক জায়গায় থাকতে কখনো পছন্দ করেন না। স্বাধীনভাবে জায়গায় জায়গায় বেড়িয়ে বেড়ান।

স্বামী তুরীয়ানন্দ সন্ন্যাসী হবার পর তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। তিনি যখন ভ্রমণ করতেন, তখন কোন গাড়ি ঘোড়ায় চড়তেন না, পায়ে হেঁটে সব জায়গায় যেতেন।

উত্তর ভারতে শীতকালে দারুণ শীত পড়ে। শীত সহ্য করতে না পেরে অনেক লোক সেখানে মারা পড়ে। স্বামী তুরীয়ানন্দ এত বেশী শীতের

মধ্যেও একটি পাতলা সুতোর চাদর গায়ে দিয়ে শীত কাটাতেন। এতে তাঁর খুব কষ্ট হলেও তিনি তা মোটেই গ্রাহ্য করতেন না।

নদী যেমন অনবরত বয়ে চলে, কোথাও স্থির থাকে না, সেরূপ স্বামী তুরীয়ানন্দও এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়ান আর নির্জন স্থান পেলেই সেখানে কিছুদিন তপস্যা করেন।

১৮৯৯ খৃস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে আমেরিকায় এসে তাঁর কাজে সাহায্য করতে ডেকে পাঠালেন।

স্বামীজীর নির্দেশমত স্বামী তুরীয়ানন্দ আমেরিকায় যান। সেখানে তাঁকে বক্তৃতা করতে বললে তিনি রাজী হন না। তিনি বলেন, বক্তৃতা দেওয়ার চাইতে কাজ করা ভাল।

কালিফোর্নিয়াতে তিনি একটি আশ্রম স্থাপন করেন। আশ্রমটির নাম 'শান্তি আশ্রম'। মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য শান্তিলাভ। আশ্রমে যাঁরা আসতেন, তিনি তাঁদের শান্তির উপায় শিক্ষা দিতেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, হরিভাই-এর মত আদর্শ পুরুষ জগতে মেলে না। আমেরিকার লোকেরা ভোগ-বিলাসিতা ছাড়া কিছুই জানে না এবং ত্যাগ ও তপস্যা কি, তারা বোঝে না। সত্যিকারের একজন ত্যাগী পুরুষকে দেখাবার জন্যে তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দকে আমেরিকায় এনেছেন। তাঁর মত একজন আদর্শ পুরুষকে দেখে আমেরিকাবাসীরা অবাক হয়ে যান।

আমেরিকা থেকে ফিরে এসে তিনি পুনরায় ভ্রমণে বেরুলেন। শেষ জীবন তাঁর কাশীতেই কেটেছে। কাশী তাঁর কাছে খুব ভাল লাগত।

১৯২২ সালের ২১ জুলাই কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে তিনি দেহত্যাগ করেন।

স্বামী সুবোধানন্দ

কলকাতার ঠনঠনে কালীবাড়ির নাম তোমরা শুনেছ। এটি বাংলার একটি প্রসিদ্ধ মন্দির।

এই মন্দিরের সংগে অনেক ইতিহাস জড়িত আছে। ১৯২৬ সালে কলকাতার দাংগায় এ মন্দির বহুবার আক্রান্ত হয়েছিল। মন্দির রক্ষা করার জন্যে বহু ছাত্র নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও দাংগাকারীদের সংগে লড়েছিল।

মন্দির রক্ষা করতে গিয়ে সার্জেন্টের গুলীতে যে দু'জন যুবক প্রাণ দিয়েছিল, তাদের স্মৃতি আজও বাঙালীর মন থেকে মুছে যায় নি।

কালীবাড়ির নিকটেই শংকর ঘোষ লেন। এই রাস্তার ওপরেই শংকর ঘোষের বাড়ি। তাঁরই নামে পথের নাম হয়েছে। এই শংকরবাবুই ঠনঠনের কালীমন্দির তৈরী করেন।

লোকমুখে শুনা যায়, শংকরবাবু স্বপ্নে মা কালীকে দেখেছিলেন। মায়ের আদেশেই তিনি মন্দির নির্মাণ করেন।

যাঁর কথা বলতে যাচ্ছি, তিনি হলেন শংকরবাবুর বাড়ির ছেলে। তাঁরই নাতি, নাম হল সুবোধচন্দ্র ঘোষ। ডাক নাম খোকা।

মায়ের আদুরে ছেলে খোকা। মা সংসারের সব কাজ সেরে সন্ধ্যে বেলায় ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বসে গল্প করতেন।

রামায়ণ-মহাভারতে কত সুন্দর সুন্দর গল্প আছে। খোকার মা সে সব গল্পই বেশী বলতেন। খোকাও সে সব গল্প খুব ভালবাসত। পিতৃসত্য পালনের জন্যে রামের বনগমন, সত্যরক্ষার জন্য যুধিষ্ঠিরের বনবাস—এ সব কাহিনী শুনে সত্যের প্রতি সুবোধের শ্রদ্ধা খুব বেড়ে গেছল। তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল, সত্যরক্ষা করতে পারলে ঈশ্বরে

ক্তি ও বিশ্বাস বাড়বে এবং নিজের জীবনকে সুন্দর ভাবে গড়ে তোলা াবে।

সুবোধের বাবা কৃষ্ণদাসবাবু বড় ধার্মিক লোক। তিনি একজন নষ্ঠাবান হিন্দু। নিষ্ঠাবান হিন্দু হয়েও তিনি মাঝে মাঝে ব্রাহ্ম সমাজে যতেন এবং ব্রাহ্মদের সংগে প্রার্থনা-সভায় যোগদান করতেন। কখনো চখনো ছেলেমেয়েদেরও তিনি ব্রাহ্ম সমাজে নিয়ে যেতেন।

কৃষ্ণদাসবাবু সাধু মহাপুরুষদের জীবনী সব সময় পড়তেন। তিনি যখন বেড়াতে বেরুতেন তখন রাস্তায় ভাল বই দেখতে পেলে সে বইটি কিনে আনতেন। এভাবে তিনি অনেক মহাপুরুষের জীবনী কিনেছিলেন।

একদিন সুবোধ বাবার টেবিলে একখানি বই দেখতে পেলেন। বইটির নাম রামকৃষ্ণের কথা। বইটি বাবার টেবিল থেকে নিয়ে তিনি পড়তে আরম্ভ করলেন। বইখানি পড়ে তাঁর বেশ ভাল লাগল। রামকৃষ্ণদেবের উপদেশগুলো পড়ে তাঁকে দেখতে তাঁর ইচ্ছে হল।

—বাবা, আমায় রামকৃষ্ণদেবের নিকট নিয়ে যাবে? তাঁকে দেখতে আমার বড্ড ইচ্ছে করছে।

—হ্যাঁ বাবা, নিয়ে যাব। আজ তো যেতে পারব না। যেদিন সময় পাব, সেদিন তোমায় নিয়ে যাব। তুমি ব্যস্ত হয়ো না।

রামকৃষ্ণদেবকে দেখার জন্যে সুবোধের মন এতই অস্থির হয়ে উঠেছিল যে তিনি আর অপেক্ষা করতে পারছিলেন না। একদিনের অপেক্ষাটা তাঁর কাছে এক মাসের মতই মনে হতে লাগল।

—বাবার কবে সময় হবে? কবেই বা তিনি নিয়ে যাবেন? আর কত দিন অপেক্ষা করব?

বাবার অপেক্ষা না করে একদিন স্কুল থেকে একজন বন্ধুকে সংগে নিয়ে তিনি দক্ষিণেশ্বরের দিকে রওনা হলেন।

দু বন্ধু চলেছেন দক্ষিণেশ্বরে, কিন্তু দুজনই পথ চেনেন না। কাজেই, রাস্তা ভুল করে তাঁদের অনেক ঘুরতে হল। ঘুরতে ঘুরতে ক্রমে তাঁরা দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হলেন।

সুবোধ বড্ড লাজুক প্রকৃতির ছেলে ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণদেবকে দেখতে এসেও লজ্জায় ঘরে ঢুকতে পারছিলেন না। তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে বন্ধুকে ঘরের দিকে এগিয়ে দিলেন। বন্ধুটি রামকৃষ্ণদেবের ঘরে ঢুকে তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি জিগ্‌গেস করলেন —কোথা থেকে আসছ ?

—আমরা কলকাতা থেকে আসছি।

সুবোধকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রামকৃষ্ণদেব জিগ্‌গেস করলেন, ও বাবুটি অত দূরে দাঁড়িয়ে কেন ? ওগো বাবু, ভেতরে এস না ?

সুবোধ এগিয়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। রামকৃষ্ণদেব নিজের কাছে, খাটের ওপর তাঁকে বসতে বললেন।

সুবোধ খাটে বসতে রাজী হলেন না। তিনি বললেন, স্কুল থেকে চলে এসেছি, আমার কাপড় ভাল নেই।

—আরে কাপড়ে কি আসে যায় ? মন ঠিক থাকলেই হল। মন পবিত্র থাকলে বাসি কাপড়েও ঠাকুর-দেবতার কাজ করা যায়।

সুবোধ তবু বসতে চান না। তিনি বসতে গিয়ে সংকোচ বোধ করেন। তারপর রামকৃষ্ণদেব হাত ধরে তাঁকে নিজের পাশে খাটে বসালেন এবং অতি আপনার লোকের মত তাঁর সংগে কথা বললেন। সুবোধ মুগ্ধ হয়ে ভাবেন তিনি লোককে কত ভালবাসতে পারেন। এমন ভালবাসার লোক তো তিনি কখনো দেখেন নি। আশ্চর্য মহাপুরুষ বটে !

তারপর থেকে সুবোধ মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বর আসেন। একদিন বেলা প্রায় তিনটে। তিনি এসেছেন রামকৃষ্ণদেবের সংগে দেখা করতে।

রামকৃষ্ণদেবের ঘরে ঢুকেই তিনি দেখলেন ঘরে লোকের ভিড়। বসার একটুও জয়গা নেই।

সুবোধকে দেখতে পেয়েই রামকৃষ্ণদেব উঠে এলেন এবং তাঁকে সংগে নিয়ে শিবমন্দিরের বারান্দায় বসালেন। তারপর সুবোধকে যোগাসনে বসিয়ে আঙুল দিয়ে জিভে কি যেন লিখে দিলেন এবং বুকে হাত দিয়ে ধ্যান করতে বললেন।

রামকৃষ্ণদেব বুকে হাত দেওয়া মাত্রই সুবোধের মনে হ'ল, পিঠের শিরদাঁড়া দিয়ে বিদ্যুতের মত কি যেন একটা মাথার দিকে উঠছে। কিছুক্ষণ পরে তিনি দেবদেবীর মূর্তি সব দেখতে লাগলেন।

সুবোধ শিরদাঁড়া দিয়ে বিদ্যুতের মত যে একটা জিনিস যাচ্ছে অনুভব করলেন, এটা কি জান? এটা হল একটা শক্তি, একে বলে কুণ্ডলিনী শক্তি। যোগী মহাপুরুষেরা বলেন, এই কুণ্ডলিনী শক্তি সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে শিরদাঁড়ার নিচের শেষ ভাগে থাকে। যোগীরা সাধনার দ্বারা যখন এ শক্তিকে জাগিয়ে তুলেন, তখন সে শক্তি সুড় সুড় করে মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে মাথার দিকে ওপরে উঠতে থাকে। এ শক্তি মাথায় উঠলে তবে ভগবানের দেখা পাওয়া যায় এবং তাঁর সংগে কথা বলা যায়।

এ ঘটনার কিছুদিন পর রামকৃষ্ণদেব দেহত্যাগ করেন, তারপর সুবোধও সংসার ত্যাগ করেন। সংসার ত্যাগ করেই তিনি দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে যান। তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোড ধরে হাঁটতে শুরু করলেন।

সুবোধ গৃহত্যাগ করে পরিব্রাজকের পোশাক পরেন। তখন তাঁর সংগে কিছুই ছিল না। পথে যখন বা জুটত তাই তিনি আহার করতেন। সারাদিন হাঁটার পর যেখানে সন্ধ্যে হত সেখানেই শুয়ে রাত কাটাতেন। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি কাশী এসে পৌছলেন।

কাশীতে তিনি অনেক দিন ছিলেন। সেখানে তিনি অনেক তপস্যা করেন। কাশী থেকে গিরনার, আবুপাহাড়, বোম্বে, দ্বারকা প্রভৃতি বহু স্থান ভ্রমণ করার পর তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন।

কলকাতায় এসে বরানগর মঠে সকলের সংগে মিলিত হন। সেখানে তাঁর সন্ন্যাস হয়। সন্ন্যাসের পর তাঁর নাম হল স্বামী সুবোধানন্দ।

বেলুড় মঠে ভক্তদের কাছে তিনি 'খোকা মহারাজ' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর নাম যেমন খোকা, তেমনি খোকার মতই তিনি সরল ছিলেন। ফটোতে তাঁর মুখ দেখলে দেখতে পাবে ছোট্ট খোকার মত মুখে হাসি লেগেই আছে।

একজন মাছ ধরছে, আর একজন পথিক তার কাছে গিয়ে জিগ্‌গেস করলে, ভাই অমুক জায়গায় কোন্ পথ দিয়ে যাব? সে ব্যক্তির ফাৎনায় তখন মাছ খাচ্ছে। সে তার কথায় কোন উত্তর না দিয়ে একমনে ফাৎনার দিকে তাকিয়ে রইল। মাছ গেঁথে তখন পেছন ফিরে বললে, আপনি কি বলছেন? সেই লোকটি প্রণাম করে বললে, আপনি আমার গুরু, আমি যখন ভগবানের ধ্যানে বসব, তখন যেন ঐরূপ কাজ শেষ না করে অন্যদিকে মন না দিই। —শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী অখণ্ডানন্দ

আমেরিকায় ভারতের বিজয় পতাকা উড়িয়ে স্বামী বিবেকানন্দ সবে মাত্র দেশে ফিরেছেন। তখনো বেলুড়মঠ হয়নি। বিবেকানন্দ সেবাধর্মের কাজও শুরু করেন নি। সে সময়ের কথা বলছি।

মঠ বরানগর থেকে আলমবাজারে উঠে গেছে। আলমবাজার মঠে অনেক সাধু আছেন। মঠে স্বামী অখণ্ডানন্দও আছেন। বাংলার পল্লীগ্রাম দেখতে তাঁর ইচ্ছে হল। তিনি আলমবাজার মঠ থেকে হেঁটে চলেছেন। চলতে চলতে ক্রমে মহুলা গ্রামে উপস্থিত হলেন।

বাংলার একটি ছোট্টগ্রাম মহুলা। মুর্শিদাবাদ জেলায় তার অবস্থান।

গ্রামটি ভারী সুন্দর। চারদিকে খোলা মাঠ। নির্জন মাঠের ওপর দিয়ে হু হু করে বাতাস বয়ে যায়। অখণ্ডানন্দ গ্রামের দৃশ্য দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছেন। এমনি সময় গ্রামের সৌন্দর্য শোভাকে ম্লান করে দিয়ে ছোট্ট একটি মুসলমান মেয়ে কেঁদে উঠল। তিনি মেয়েটির কাছে এসে জিগগেস করলেন, কেন কাঁদছ? কি হয়েছে তোমার?

মেয়েটি তাঁর কথার কোন জবাব না দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তার কান্না দেখে অখণ্ডানন্দ আরও ব্যস্ত হয়ে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে জিগ্‌গেস করলেন, তোমার কোন ভয় নেই, আমায় বল, তুমি কাঁদ কেন?

মেয়েটি তখন চোখের জল মুছতে মুছতে বললে, আমার জলের কলসী ভেঙ্গে গেছে, বাড়িতে গেলে মা বকবে। আর একটি কলসী কিনে নেবার মত আমার কাছে পয়সা নেই। তাই আমি কাঁদছি।

—আচ্ছা, তুমি কেঁদো না। আমি তোমায় একটি কলসী কিনে দেব।

অখণ্ডানন্দের কাছে পথের সম্বল মাত্র চার আনা পয়সা ছিল। তাই থেকে তিনি একটি জলের কলসী ও কিছু খাবার কিনে মেয়েটির হাতে দিলেন। মেয়েটি কলসী আর খাবার পেয়ে আনন্দে নাচতে নাচতে চলে গেল।

স্বামী অখণ্ডানন্দ সেখান থেকে আবার হাঁটতে সুরু করলেন। কিছু দূর এগিয়ে যেতেই একদল লোক তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল, তাদের মুখে শুধু এক কথা, বাবা খাবার দাও। ক্ষিদের জ্বালায় মরে গেলাম। লোক-গুলোর চেহারা দেখতে ভূতের মত, গায়ের রং কালো, হাড় কয়টি ছাড়া তাদের শরীরে আর কিছুই নেই। আর এক জায়গায় দেখতে পেলেন কতকগুলো লোক একটা মরা কুকুরের দেহ নিয়ে টানাটানি করছে। অপর এক জায়গায় কয়েকজন মিলে ঘাস পাতা চিবুচ্ছে।

—একি কাণ্ড! অমনটি তো আমি আর কোথাও দেখি নি। এ গ্রামে হল কি?

গ্রামের লোকের দুঃখ দেখে তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। বাংলার পাড়াগাঁ কি তবে সব এ রকম? আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। পাগলের মত অস্থির হয়ে রাস্তায় যাকে পান তাকেই জিজ্ঞেস করেন। পরে জানতে পারলেন এখানে দুর্ভিক্ষ লেগেছে, তাই খেতে না পেয়ে খাবার সন্ধানে লোকজন ছুটাছুটি করছে, ঘাস, পাতা, কুকুর, বেড়াল, যা পাচ্ছে তাই খাচ্ছে।

স্বামী অখণ্ডানন্দ আগে কখনো দুর্ভিক্ষ দেখেন নি, দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের দেখে মর্মাহত হলেন, তিনি তাদের সেবা করার জন্য সেখানে থেকে গেলেন।

এভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবার কাজ শুরু হবার আগে থেকেই তিনি মহলাতে সেবার কাজ আরম্ভ করলেন।

দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের সেবা করতে করতে তিনি দুটি ছেলেকে কুড়িয়ে পেলেন। তাদের মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই, তারা অনাথ। ছেলে দুটিকে তাঁর সংগে রাখলেন। এভাবে আরও কয়টি ছেলেকে কুড়িয়ে পান, এ সব ছেলেদের নিয়ে তিনি একটি অনাথ আশ্রম করলেন। মহুলাতে এভাবে আশ্রম গড়ে উঠল।

কিছুদিন পরে মহুলা থেকে আশ্রম সারগাছিতে তুলে নেওয়া হয়। সারগাছি আশ্রমে এখনো অনেক অনাথ ছেলে মানুষ হচ্ছে। এ সব ছেলেরা আশ্রমে লেখাপড়া ও শিল্পকাজ শিক্ষা করে।

পরের দুঃখ সইতে না পেরে যে মহাপুরুষ এমনিভাবে মানুষের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর বিষয় জানতে সকলেরই ইচ্ছা করে। এখন তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলব।

স্বামী অখণ্ডানন্দ সন্ন্যাসী হবার আগে গংগাধর ঘটক নামে পরিচিত ছিলেন। বাগবাজারের বোসপাড়া কলকাতার মধ্যে একটি নামকরা পল্লী। এই বোসপাড়ায় ছিল তাঁর বাড়ি।

স্বামী তুরীয়ানন্দের কথা তোমরা আগেই জেনেছ। তিনিও এ পাড়ার ছেলে ছিলেন। তাঁর ছোটবেলার নাম ছিল হরিনাথ।

গংগাধর ও হরিনাথে খুব ভাব ছিল। দু'জনে এক সংগে খেলাধূলা করা, বেড়ানো, গল্পগুজব সবকিছুই করতেন। আবার দু'জনাতে খাবার দিকেও বেশ মিল ছিল! হরিনাথ নিজে রান্না করে খেতেন। একথা তাঁর জীবনীতেও বলেছি। গংগাধরও তাই করতেন। তাঁরা দু'জনে খুব নিষ্ঠার সংগে সব কাজ করতেন। ভাত খাবেন তাও সেদ্ধ ভাতে ভাত ছাড়া অন্য কিছু খাবেন না। গোঁড়া বামুনরা যেমন গংগায় চান করে তিন বেলা জপতপ আহ্নিক করেন, গংগাধরও সেরূপ করতেন। তাছাড়া তাঁর গীতা-উপনিষদ পাঠ করা একটা নিত্য কর্ম ছিল।

ভগবানকে দেখব, তাঁর সংগে কথা বলব, এ ভাব গংগাধরের খুব ছোটবেলা থেকেই ছিল। তিনি যখন অষ্টম কি নবম শ্রেণীর ছাত্র তখন তাঁর মনে একবার প্রশ্ন ওঠে, আচ্ছা, পড়াশোনা করে ভগবানকে পাওয়া যাবে কিনা? লেখাপড়া করে যদি তাঁকে পাওয়া না-ই যায়, তবে অত পড়ে কি হবে? আমি আর পড়ব না। তারপর বাড়িতে কাউকে কিছু না বলে একজন সাধুর সংগে চলে যান।

সেই সাধু তিন দিনের বেশী এক জায়গায় থাকেন না, তিনি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন, গংগাধরও তাঁর সংগে ঘুরতে লাগলেন।

কিছুদিন পর বাড়ির জন্যে তাঁর মন কেমন করতে লাগল। মা তাঁকে কত ভালবাসতেন, মা বোধ হয় তার জন্যে কত ভাবছেন। এ সব কথা মনে হতেই তিনি আর থাকতে পারলেন না। তিনি বাড়ি ফিরে এলেন।

এভাবে হঠাৎ চলে যাওয়াতে অনেকদিন তাঁর পড়াশোনা কিছুই হয় নি। বাড়ি এসে আবার স্কুলে যাবেন ঠিক করলেন, কিন্তু পড়তে গিয়ে দেখেন সব ভুলে গেছেন। কাজেই, স্কুলে যাওয়া আর হল না। এভাবেই তাঁর স্কুলের পড়া শেষ হল। স্কুলে না গিয়ে তিনি বাড়িতেই পড়তে লাগলেন। তখন তিনি গীতা, উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্রের বই বেশী পড়তেন।

গংগাধরের বন্ধু হরিনাথ একদিন এসে বললেন, গংগা, একজন বড় সাধু দেখতে যাবি?

—কোথায় রে সাধু?

—দক্ষিণেশ্বরে। আমি মাঝে মাঝে তাঁর কাছে যাই। তিনি ভারী সুন্দর সুন্দর গল্প বলেন। একবার গেলে আর আসতে ইচ্ছা করে না।

—তাই নাকি? তবে আমায় নিয়ে চল না?

—আমিও তো তাই বলছি; চল না একদিন।

—বেশ, কবে যাবি বল?

—কালই চল।

—বেশ, তাই চল।

দু বন্ধুতে মিলে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করতে চলে গেলেন। রামকৃষ্ণদেবের সংগে দেখা হইতেই তিনি তাঁদের খুব আদর যত্ন করলেন এবং মা কালীর প্রসাদ খেতে দিলেন।

গংগাধরও তাঁর ভালবাসায় মুগ্ধ হলেন, এর পর থেকে তিনিও মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে আসতেন।

গংগাধর গোঁড়া বামুন ছিলেন। অপরের হাতের রান্না কখনো খেতেন না। একথা আগেই বলেছি। একদিন হল কি, দক্ষিণেশ্বরে তাঁকে মা কালীর প্রসাদ খেতে দিলে তিনি তা খেলেন না, সামান্য ফল মিষ্টি মুখে দিয়ে উঠে পড়লেন। রামকৃষ্ণদেব তা দেখলেন। তিনি তাকে ডেকে নিয়ে কাছে বসিয়ে বললেন, মায়ের প্রসাদ খেলে না, সে কি গো? গংগাজলে রান্না হয়। কত পবিত্র। এ যে তোমার হবিষ্যান্নের চেয়েও পবিত্র। ছিঃ, অমন করতে আছে? যাও দেরি কর না প্রসাদ খেয়ে নাও।

রামকৃষ্ণদেবের কথায় তিনি মায়ের প্রসাদ খেলেন।

রামকৃষ্ণদেব অসুস্থ হয়ে কাশীপুর বাগানবাড়িতে এলে তখন শিষ্যেরা তাঁর খুব সেবা করেছিলেন। একথাও আগেই বলেছি। গংগাধরও তখন গুরুর খুব সেবা করেছিলেন।

রামকৃষ্ণদেবের শরীর যাবার পর সন্ন্যাসী শিষ্যেরা বরানগর মঠে

মিলিত হলে গংগাধরও তাতে যোগদান করেন। সেখানে তিনি সন্ন্যাস নেন, তাঁর সন্ন্যাসী নাম হয় স্বামী অখণ্ডানন্দ।

বরানগর মঠে কিছুদিন কঠোর তপস্যা করে স্বামী অখণ্ডানন্দ পরিব্রাজকের বেশে তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। কাশী, উত্তরাখণ্ড, তিব্বত, মানস সরোবর প্রভৃতির ন্যায় দুর্গম পথে বহুদিন তিনি একা একা ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিব্বতে যাবার সময় পথে কয়েকবার তাঁকে ডাকাতে আক্রমণ করেছিল।

তিব্বতে তিনি তিন বছর ছিলেন। তিব্বতী ভাষায় তিনি কথা বলতে পারতেন।

তিব্বত থেকে ফিরে এসে তিনি ক্ষেত্রী, উদয়পুর, ভাগলপুর ও মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন। ক্ষেত্রীতে সংস্কৃত টোল ও বেদ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ সব ছাড়া তিনি অনেক জায়গায় বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী-পীড়িত লোকদের সেবা করেছিলেন।

১৯৩৪ সালে স্বামী শিবানন্দের দেহত্যাগের পর তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

ছেলেরা অন্যের কাছ থেকে ধার করে কতকগুলো কথা মুখস্থ করে পাশ করছে। এদের বিদ্যা হচ্ছে ধোবা-ভাঁড়ারের মত। ধোবার নিজের কাপড় নেই, সব পরের কাপড়।

আমাদের দেশের ছেলেরা বলবে.—মিল্টন এই বলেছে, সেক্সপীয়ার এই বলেছে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এই বলছে। আর যদি জিগ্‌গেস করা যায়, তুমি কি বলছ? তাতে বলবে, আমি কি বলব—বাস—এককথায় সব শেষ। ধার করা বিদ্যা জীবনের কোন প্রকৃত কাজেই আসে না।

—স্বামী অভেদানন্দ

স্বামী নির্মলানন্দ

২৩ ডিসেম্বর, বুধবার ১৮৬৩।

আজ বড্ড শীত। কন কনে শীতের রাতের আকাশ বেশ পরিষ্কার। একটু কুয়াসা নেই। পূর্ণিমার চাঁদের মত আকাশে বড় চাঁদ উঠেছে। চাঁদের মধুর আলোয় চারদিক ঝকমক করছে। আকাশের তারাগুলো সব মিটমিট করে হাসছে। দেয়ালে টাঙানো বড় ঘড়িতে ঢং করে একটি শব্দ হল। সাড়ে আটটা বাজার শব্দ। এমনি সময় ২০ নং বোসপাড়া লেনের বাড়িতে শাঁখ বেজে উঠল।

পাড়ার ভেতর দিয়ে লোকজন চলে বেড়ায়। শাঁখ বাজার শব্দ শুনে তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, দেবনাথ দত্তের আর একটি ছেলে হল!

দেবনাথ বাবুর স্ত্রী তুলসী গাছ বড্ড ভালবাসতেন। তিনি রোজ সকালে স্নান করে তুলসী গাছে জল দিতেন আর সন্ধ্যেবেলায় ধূপধুনো দিয়ে পূজো করতেন। তুলসীভক্ত মা তাই আদর করে ছেলের নাম রাখলেন তুলসীচরণ।

মা ছেলেকে নিয়ে চলে গেলেন কাশীতে। মহাতীর্থ কাশীধাম। শিব ঠাকুরকে প্রণাম করে মা ছেলেকে মানুষ করতে লাগলেন।

আদরের ধন, চোখের মণি তুলসী, মায়ের কোলে দিন দিন বড় হতে লাগলেন। এ ভাবে দশটি বছর কেটে গেল। তারপর একদিন হঠাৎ মা ছেলের মায়া কাটিয়ে শিব ঠাকুরের নাম নিয়ে সংসার থেকে বিদায় নিলেন!

১৮৭৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর তারিখে বারাণসী গণেশ মহল্লার গংগাবাবুর বাড়িতে কান্নার রোল উঠল।

দেবনাথ বাবুর আর এক নাম গংগা দত্ত।

মাতৃহারা ছেলেকে কাছে রেখে গংগাবাবু মানুষ করতে লাগলেন। এগার বছর পূর্ণ হলে ছেলেকে তিনি বাঙালী-টোলা হাই স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন।

তুলসী রোজ স্কুলে যান, পড়াশোনা করেন আর স্কুল থেকে এসে বিকেলে খেলা করেন। স্কুলে তাঁর কয়েকজন বন্ধু জুটে গেল। স্কুলের বন্ধুদের মধ্যে হরিপ্রসন্নের সংগে তাঁর বেশী ভাব। তাঁর সংগে মিশে ও খেলা করে তিনি বেশী আনন্দ পান।

হরিপ্রসন্নও বড় হয়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। তাঁর সন্ন্যাস নাম ছিল স্বামী বিজ্ঞানানন্দ। তাঁর কথা পরে বলব।

ত্রৈলংগ স্বামী সে সময় কাশীতে থাকতেন। তিনি একজন নামকরা বড় সাধু মহাপুরুষ। অনেক তাঁকে কাশীর শিব বলতেন। তাঁর চেহারা ছিল শিবেরই মত মোটা। তিনি সারা গায়ে ভস্ম মেখে থাকতেন। বিশেষ প্রয়োজন না হলে কারুর সংগে কথা বলতেন না। কথা কম বলার জন্যে সকলেই তাঁকে মৌনী বাবা বলত।

তুলসীচরণ তাঁর কাছে মাঝে মাঝে যেতেন। তাঁর উপদেশগুলো তাঁর খুব ভাল লাগত।

দেখতে দেখতে কটি বছর কেটে গেল। গংগাবাবু ছেলেকে কাশী রেখে কলকাতায় চলে আসলেন।

কলকাতায় আসার কিছুদিন পরই হঠাৎ একদিন তিনিও মারা গেলেন।

পিতার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে তুলসী কলকাতায় চলে আসেন। তার পর আর তার কাশী যাওয়া হল না। তিনি কলকাতায় পড়তে আরম্ভ করলেন। তার দু বছর পরে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন এবং তাতে পাশ করেন।

কলকাতায় এসেও তাঁর অনেক বন্ধু জুটল। তিনি পাড়ার ছেলেদের সংগে মিশে রোজ বিকেলে খেলা করতেন।

খেলা করার সময় একদিন শুনতে পেলেন পাড়ার বলরাম বোসের বাড়িতে পরমহংসদেব আসছেন। ছেলেদের মহলেও একথাটা রটেছে যে পরমহংসদেব এক মস্ত বড় সাধু। কৌতূহলে ছেলেরাও খেলা ফেলে ছুটল তাঁকে দেখতে। তুলসীও গেলেন।

তুলসীচরণ বলরাম বাবুর বাড়ি ঢুকে দেখলেন খুব ভিড়। ভেতরে ঢোকাই যায় না। ভিড় ঠেলে কোন রকমে ভেতরে ঢুকে চুপ করে তিনি এক কোণে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পরে পরমহংসদেব এলেন। তারপর সকলেই উঠে তাঁকে প্রণাম করতে লাগল। তুলসী ভিড়ের মধ্যে এগুতে পারলেন না। সকলের প্রণাম করা হয়ে গেলে পর তিনি প্রণাম করতে গেলেন। তুলসী তাঁকে প্রণাম করতেই হঠাৎ কেমন যেন একটা শক পেলেন। শক পেয়ে মনে হল বিদ্যুতের একটা শক্তি যেন তাঁর শরীরে ঢুকে গেল। তিনি ভয়ে পালিয়ে গেলেন।

পাড়ার ছেলেদের মধ্যে হরিনাথের সংগে তাঁর বেশী বন্ধুত্ব ছিল। হরিনাথের কথা আগেই বলেছি। তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দ নামে পরিচিত ছিলেন।

একদিন তুলসী হরিনাথের বাড়ি বেড়াতে যান। হরিনাথ তাঁকে বললেন, চল আমরা দক্ষিণেশ্বরে বেড়িয়ে আসি। সেখানে একজন পরমহংস থাকেন। তাঁকে দেখতে যাব।

তুলসীচরণ বলরাম বোসের বাড়িতে একবার পরমহংসদেবকে দেখছেন। কিন্তু এই পরমহংসদেবই যে দক্ষিণেশ্বরে থাকতেন তা তিনি জানতেন না। আর একজন পরমহংস দেখতে পাবেন মনে করে তিনি দক্ষিণেশ্বরে যেতে রাজী হলেন।

হরিনাথের বাড়িতে তাঁর আরও কয়েকজন বন্ধু ছিল, তাদের নিয়ে তিনি গংগায় চান করতে গেলেন। তুলসীও সংগে ছিলেন। চান করার পর তাঁরা একটা নৌকো ভাড়া করে দক্ষিণেশ্বরের দিকে রওনা হলেন। কিন্তু তুলসীচরণ তাঁদের সঙ্গে গেলেন না, তিনি বাড়ি ফিরে এলেন।

তিনি বাড়ি এসে খাবার খেয়ে হেঁটে দক্ষিণেশ্বর রওনা হলেন। দক্ষিণেশ্বরে এসে হরিনাথের সংগে তাঁর দেখা হল। তাঁরা আগেই সেখানে পৌচেছেন।

কালীবাড়িতে ঢুকেই তাঁরা শুনলেন রামকৃষ্ণদেব নেই। তিনি বাইরে বেড়াতে গেছেন এবং সন্ধ্যায় ফিরে আসবেন।

রামকৃষ্ণদেবকে দেখতে না পেয়ে তাঁদের মন খুব খারাপ হয়ে যায়। তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, পরমহংসদেব যখন নেই তখন কালীবাড়িটা সব ঘুরে দেখি না কেন? তারপর সকলে মিলে ঘুরে ফিরে সব দেখতে লাগলেন।

কালীমন্দির, শিবমন্দির, পঞ্চবটী প্রভৃতি দেখতে দেখতে তাঁরা রামকৃষ্ণদেবের ঘরে ঢুকলেন। সে ঘরে রামকৃষ্ণদেবের একটা ফটো ছিল। ফটোখানি দেখেই তুলসীচরণ বন্ধুদের জিগ্‌গেস করলেন এটি কার ফটো?

—এ ফটো পরমহংসদেবের।

—এর আগে তাঁকে দেখেছি বলে মনে হয়।

তখন হরিনাথ জিগ্‌গেস করলেন, কোথায় দেখেছ? তুমি তো আর কখনো এখানে আস নি, তবে কি করে দেখলে?

—কেন, বলরাম বোসের বাড়িতে দেখেছি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তবে ঠিকই দেখেছ। তিনি সেখানে মাঝে মাঝে যান।

আর একদিন তুলসীচরণ একা এসে রামকৃষ্ণদেবের সংগে দেখা করেন এবং তাঁর সংগে আলাপ করে তিনি মুগ্ধ হন।

এর পর থেকে তুলসীচরণ মাঝে মাঝে রামকৃষ্ণদেবের নিকট যাতায়াত করতেন।

রামকৃষ্ণদেবের শরীর যাবার পর তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যেরা বরানগর মঠে মিলিত হন। এ কথা আগেও বলা হয়েছে। তুলসী তখনো বাড়ি ছেড়ে আসতে পারেন নি। তাঁর মন পড়ে থাকে বরানগরে, কিন্তু সংসার ধরে রাখে, কিছুতেই বাড়ি ছাড়তে পারেন না।

এমনি ভাবে দিন যেতে লাগল, তুলসীর মনের ব্যাকুলতাও ক্রমে বেড়েই চলল। যতই দিন যায় তিনি আরও অস্থির হয়ে পড়েন।

সংসারের বন্ধন ছিন্ন করে হঠাৎ একদিন তিনি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। সংসারের স্নেহ-মায়া-মমতা কোন কিছুই তাঁকে ধরে রাখতে পারলে না।

বরানগর মঠে তখন সাধনার অগ্নি-পরীক্ষা চলেছে। তুলসীচরণও সেখানে নিজেকে সাধনায় ডুবিয়ে দিলেন।

কিছুদিন পরে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে স্বামী নির্মলানন্দ নাম ধারণ করেন।

বরানগর মঠ থেকে স্বামী নির্মলানন্দ তীর্থ ভ্রমণে বেরুলেন।

রামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থান কামারপুকুর ও জয়রামবাটি দর্শন ক'রে তিনি পায়ে হেঁটে কাশী চলে যান। কাশী থেকে লক্ষৌ, অযোধ্যা হয়ে হরিদ্বার পৌঁছেন। হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশে গমন করেন এবং সেখানে কিছুদিন তপস্যা করেন।

হৃষীকেশের ধার দিয়ে গিয়েছে গংগা। গংগার ওপারে আর একজন সাধু থাকতেন। তিনি একজন জ্ঞানী মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি সব সময় শিবোহম্ শিবোহম্ বলে মন্ত্র পড়তেন।

একদিন তিনি বসে বসে মন্ত্র পড়ছেন, ঠিক সেই সময় পাশের জংগল

থেকে একটি বাঘ এসে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাধু কিন্তু তাতে মোটেই ভয় পেলেন না। বাঘ তাঁকে মুখে করে নিয়ে জংগলে পালিয়ে গেল।

স্বামী নির্মলানন্দ এপার থেকে সব দেখলেন, সাধুর সাহস দেখে অবাক হলেন। সামনে মৃত্যু জেনেও সাধু মোটেই ভীত হলেন না। এ বড় আশ্চর্য লাগল তাঁর কাছে।

শোনা যায়, সাধু-সন্ন্যাসীরা মরতে ভয় পায় না। এর যেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল।

তিনি হৃষীকেশ থেকে লক্ষ্মণঝোলা, উত্তরকাশী, দেবপ্রয়াগ, কেদার-বদ্রী প্রভৃতি হিমালয়ের বহু তীর্থস্থান ভ্রমণ করেন। তারপর কলকাতায় চলে আসেন।

কলকাতায় এসে শুনলেন, বরানগর থেকে মঠ আলমবাজারে উঠে গেছে। তিনি আলমবাজার মঠে এসে গুরুভাইদের সংগে মিলিত হলেন।

১৯০৩ সালে স্বামী অভেদানন্দের কাজে সাহায্য করতে তিনি আমেরিকায় যান। সেখানে তিনি দু' বছর ছিলেন।

স্বামী নির্মলানন্দ দক্ষিণ ভারতে অনেকগুলো আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন; কলকাতার রামকৃষ্ণ সারদা মঠও তাঁরই প্রতিষ্ঠিত।

যদি জগতে কিছু পাপ থাকে, তবে দুর্বলতাই সেই পাপ। সর্বপ্রকার দুর্বলতা ত্যাগ কর। দুর্বলতাই মৃত্যু, দুর্বলতাই পাপ। —স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

রবিবার।

স্কুল, কলেজ, অফিস সব বন্ধ। ছুটির দিন বলে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণদেবের ঘরে লোকের খুব ভিড়। রামকৃষ্ণদেব গল্পের ছলে তাঁদের উপদেশ দিচ্ছেন। সকলেই মন দিয়ে তাঁর কথাগুলো শুনছেন।

এমন সময় একজন যুবক ঘরে ঢুকলেন। তিনি ঢুকেই ঘরের এক কোণে বসে পড়লেন। রামকৃষ্ণদেব কথা বলতে বলতে একবার তাঁর দিকে তাকালেন। যুবক ছেলেটি উঠে এসে তাঁকে প্রণাম করলেন।

—তুই কুস্তি লড়তে পারিস। আমার সংগে লড়তে পারবি?

—আজ্ঞে, কুস্তি লড়তে পারি সত্য, তাই বলে আপনার সংগে লড়ব কেন? আপনি কি আমার সংগে লড়তে পারবেন?

—লড় দেখি এক হাত। কেমন লড়তে পারিস দেখব।

কথা বলতে বলতেই রামকৃষ্ণদেব উঠে দাঁড়ালেন। তারপর পালোয়ানের মত তাল ঠুকতে শুরু করে দিলেন। যুবক ছেলেটি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। রামকৃষ্ণদেব এগিয়ে এসে তাঁর দু' হাত ধরে জোরে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে দেওয়ালের গায়ে চেপে ধরলেন।

যুবকটি ছিলেন একজন ব্যায়ামবীর, তিনি ভাল কুস্তি লড়তে পারতেন। এত বড় একজন ব্যায়ামবীরের সংগে রামকৃষ্ণদেব পারবেন কি করে! ব্যায়ামবীর ছেলেটি প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারেন নি যে তাঁর সংগে সত্যি সত্যি তিনি লড়বেন। সেজন্যে তিনি চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু যখন রামকৃষ্ণদেব তাঁকে ঠেলতে ঠেলতে দেওয়ালের গায়ে চেপে ধরলেন, তখন তিনিও একটা কুস্তির প্যাঁচ মারতে প্রস্তুত হলেন।

জোর দেখাতে গিয়ে তিনি অনুভব করলেন বিদ্যুতের মত একটা

শক্তি তাঁর ভেতর ঢুকে গেল। তারপর সংগে সংগে তাঁর শরীরও অবশ হয়ে গেল। তিনি কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পরে রামকৃষ্ণদেব হাসতে হাসতে বললেন, কি গো, আমাকে হারালে না ?

যুবক ছেলেটি কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলেন। তিনি ভাবলেন, এর কি জবাব দেব! তাঁর যে কি অদ্ভুত শক্তি আছে আমরা তা বুঝব কি করে।

তারপর রামকৃষ্ণদেব তাঁর পিঠে আস্তে করে একটি চড় মেরে বললেন, বেশ, বেশ, মাঝে মাঝে এখানে আসবে।

যে পালোয়ানের সংগে রামকৃষ্ণদেব কুস্তি লড়েছিলেন, তিনি হলেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ। তখন তাঁর নাম ছিল হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

হরিপ্রসন্নের বাবার নাম তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়। বেলঘরিয়াতে তারকনাথের বাড়ি। বেলঘরিয়া ২৪ পরগণা জেলার একটি গ্রাম।

তারকবাবু সামরিক বিভাগে কাজ করতেন। সামরিক বিভাগের কাজ নিয়ে তাঁকে দেশ-বিদেশে অনেক জায়গায় ঘুরতে হত। তিনি এটোয়াতে কিছুদিন কাজ করেছিলেন। সেখানে হরিপ্রসন্নের জন্ম হয়।

কাশীর বাঙালী-টোলাতে তারকনাথের আর একটি বাড়ি ছিল। সেখানে তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে অনেকেই থাকতেন। পড়ার সুবিধার জন্যে ছেলেমেয়েদের তিনি কাশীতে রাখলেন।

হরিপ্রসন্ন নসীরাম সরকারের পাঠশালায় ভর্তি হলেন। পাঠশালার পড়া শেষ করে বাঙালী-টোলা হাইস্কুলে কিছুদিন পড়াশোনা করেন। তারপর কলকাতা চলে আসেন এবং হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। এখান থেকে এনট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। তারপরে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়েন।

সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ তখন বউবাজারে ছিল। স্বামী সারদানন্দ,

প্রবাসীর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সেই কলেজেই পড়তেন। হরিপ্রসন্ন তাঁদের সহপাঠী ছিলেন।

হরিপ্রসন্নের সত্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল। ছেলে বয়স থেকে তাঁর এ গুণটুকু ছিল। একবার তাঁর মা কোন কারণবশতঃ তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেন। এতে তাঁর মনে খুব দুঃখ হয়। তিনি মাকে অনেক বুঝিয়ে বলেন, মা আমি মিথ্যা বলছিনা, তবু কেন তুমি আমায় মিথ্যাবাদী বলছ!

এত বলা সত্ত্বেও মা ছেলের কথায় বিশ্বাস করলেন না। তখন হরিপ্রসন্ন খুব চটে যান। তিনি রেগে গিয়ে পৈতে ছিঁড়ে বললেন, যদি মিথ্যা কথা বলি তবে আমি ব্রাহ্মণ নই।

আমাদের সংসারে একটা প্রবাদ আছে ব্রাহ্মণ রেগে পৈতে ছিঁড়লে অমংগল হয়। ছেলেকে পৈতে ছিঁড়তে দেখে তাঁর ভারী দুঃখ হ'ল। কি জানি কি হয়, এই আশংকায় মা চিন্তিত হলেন। তিনি ছেলেকে তিরস্কার করে বললেন, কি ভয়ানক অন্যায় করলি বল দেখি?

কোয়েটার যুদ্ধে তারকবাবুর মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যু-সংবাদে হরিপ্রসন্ন অস্থির হয়ে পড়েন। পিতৃশোকে কতদিন পড়াশুনা ভাল করতে পারেন নি। মানসিক অশান্তি নিয়েই তিনি এফ-এ পরীক্ষা দেন। পরীক্ষার ফল বের হলে দেখা গেল কোন প্রকারে পাশ করেছেন মাত্র।

কিছুদিন পরে তিনি পাটনা চলে আসেন এবং পাটনা কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তিনি বি-এ পাশ করে পুণায় চলে যান। পুণাতে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হন।

পুণা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে যে সব ছাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে, তাদের বোম্বাই ও ভারত সরকার চাকরি দেন।

হরিপ্রসন্নের সংগে আরও পাঁচজন বাঙালী ছেলে সেই কলেজে পড়তেন। তার মধ্যে রাধিকাপ্রসন্নের সংগে তাঁর খুব ভাব হয়। তাঁরা

দু'জন এক সংগে খুব মেলামেশা করতেন। রাধিকাপ্রসন্ন পড়াশোনায়ও ভাল ছাত্র ছিলেন। একটি মারাঠা ছেলে তাঁদের সহপাঠী ছিলেন। মারাঠা ছেলেটি ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করতেন। মহীশূর সরকারের কাছ থেকে তিনি বৃত্তি পেতেন। ক্লাসের মধ্যে হরিপ্রসন্নও একজন নামকরা ছাত্র। তিনি ক্লাসে দ্বিতীয় হতেন। আর রাধিকাপ্রসন্ন তৃতীয় স্থান পেতেন।

রাধিকাপ্রসন্নের সংসারের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। তিনি কলেজ থেকে যা বৃত্তি পেতেন, তাতে নিজের পড়ার খরচ চালাতেন। সামান্য বৃত্তি থেকে সমস্ত খরচ চালানো তাঁর পক্ষে খুবই কষ্টকর হত।

হরিপ্রসন্ন দেখলেন, বন্ধু রাধিকাপ্রসন্ন যদি দ্বিতীয় স্থান না পান তবে তিনি সরকারী চাকরী পাবেন না। তাঁর সাংসারিক অবস্থা ভাল নয়, কাজেই, চাকরি না পেলে তাঁর খুব অসুবিধা হবে।

হরিপ্রসন্ন বন্ধুকে ডেকে বললেন, ভাই রাধিকাপ্রসন্ন, আমি ঠিক করেছি এবার পরীক্ষা দেব না। আমি পরীক্ষা না দিলে তুমি দ্বিতীয় হতে পারবে। তা হলে তোমার চাকরির জন্য আর ভাবতে হবে না।

সে বছর হরিপ্রসন্ন পরীক্ষা দিলেন না। কিন্তু বন্ধু রাধিকাপ্রসন্নও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতে পারলেন না। হরিপ্রসন্ন এক বছর পরে পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তারপরে তিনি ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গাজীপুরে চলে যান।

গাজীপুরে পওহারী বাবা থাকতেন। তাঁর কাছে তিনি মাঝে মাঝে যেতেন।

পওহারী বাবা একজন বড় সাধু। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছিলেন। এখানে তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলব। তাঁর জীবন থেকে তোমরাও অনেক কিছু শিখতে পারবে।

পওহারী বাবা থাকতেন এক গুহায়। গুহার মধ্যে থেকে তিনি সব সময় সাধনায় ডুবে থাকতেন। তিনি কি খেয়ে জীবন ধারণ করতেন কেউ জানত না।

পওহারী কথার অর্থ পবন-আহারী অর্থাৎ যে শুধু বাতাস খেয়ে থাকে।

পওহারী বাবার আশ্রমে একবার চোর ঢোকে। চোর পূজোর বাসনগুলো নেবার জন্য একত্র করে বাঁধছিল, ঠিক সেই সময় পওহারী বাবা চোরের সামনে গিয়ে পড়লেন। চোর তাঁকে দেখে পুঁটলি ফেলে ভয়ে ছুটে পালাল।

চোরকে পালিয়ে যেতে দেখে পওহারী বাবা পুঁটলিটি মাথায় নিয়ে চোরের পেছনে পেছনে ছুটতে লাগলেন। চোর মনে করলে তাকে ধরতে আসছেন। কাজেই, সে ভয়ে আরও ছুটতে লাগল।

চোর দৌড়তে দৌড়তে হাঁপিয়ে পড়ে এক জায়গায় বসে পড়ল। তিনি তাকে ধরে ফেললেন, তারপর জিনিসগুলো তার কাছে রেখে বললেন, ভাই তোমার কাজে ব্যাঘাত করে বড় অন্যায় করেছি। তোমার জিনিস ফেলে চলে এসেছে, তাই সেগুলো তোমায় দিতে এলুম।

চোর তো অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল। সে মনে করলে জিনিসগুলো তার হাতে দিয়ে তিনি হয় তো পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবেন। কাজেই, ভয়ে সে জিনিস নিতে চাইলে না। কিন্তু তিনিও ছাড়বেন না ; তুমি গরিব লোক, তাই তো চুরি করতে এসেছিলে। এ জিনিসগুলো আমার দরকার নেই। এগুলো তুমি নাও। এ ভাবে অনেক করে বুঝালে পর চোরের বিশ্বাস হল যে, সত্যি তিনি এগুলো দিতে চাইছেন। কিন্তু তবু সে জিনিস নিতে চায় না। তার জীবনে পরিবর্তন দেখা দিল। সে ভাবলে তিনি কত বড় সাধু, আর আমি কিনা তাঁর জিনিস চুরি করতে গেছি !

পওহারী বাবা জিনিসগুলো জোর করে চোরকে দিয়ে চলে এলেন।

পওহারী বাবার জীবনের আরও অদ্ভুত ঘটনা আছে। সে সব আর এখানে উল্লেখ করলুম না।

হরিপ্রসন্ন গাজীপুরে অনেকদিন ছিলেন। তারপর ভারত সরকারের অধীনে মীরাট, বুলন্দ-শহর, এটোয়া ও মধ্য প্রদেশের অনেক জায়গায় কাজ করেছেন।

হরিপ্রসন্ন ১৮৯৬ সালে সরকারী কাজ ছেড়ে দিয়ে আলমবাজার মঠে যোগদান করেন। তিনি মঠে আসার কয়েক মাস পরে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে ফিরে আসেন। আলমবাজার মঠে তাঁর সন্ন্যাস হয়। তখন থেকে তিনি স্বামী বিজ্ঞানানন্দ নামে পরিচিত।

স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশ মত বেলুড়ে রামকৃষ্ণদেবের নতুন মন্দিরের নক্সা স্বামী বিজ্ঞানানন্দ তৈরী করেন। এই মন্দিরটি এখন বাংলার মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং ভারতের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ মন্দির। দেশ-বিদেশ থেকে মন্দির দেখতে লোক আসে।

১৯৩৭ সালে স্বামী অখণ্ডানন্দের দেহত্যাগের পর তিনি বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

প্রত্যেক ভারতবাসীকেই ভারতের নেতা হবার উপযুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ চরিত্রবান, স্বার্থত্যাগী, পবিত্রাত্মা ও উদারচেতা হতে হবে। দেশের, লোকদের ভালবাসতে হবে। দেশের যাতে ভাল হয়, সে রকম কাজ যেন প্রত্যেকে করতে পারে, এ বিষয়ে যত্নবান হতে হবে। —স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

স্বামী অদ্বৈতানন্দ

নিঝুম দুপুর রাত্ত।

ঝিঁঝিঁ পোকার ঝিঁ ঝিঁ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। তবে পেঁচার ডাক মাঝে মাঝে শোনা যায়। এমনি ঘুটঘুটে নিশুতি রাত্রেই গা ছম্‌ছম্‌ করে ওঠে। তাই ভয় পাবার কিছু না থাকলেও মানুষ ভয় পায়।

গভীর রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে আছে। কোন সাড়া শব্দ নেই। এমনি সময় হঠাৎ দরজায় কড়া নড়ে উঠল।

—কে, এত রাতে দারজায় কড়া নাড়ছে?

—দাদা ঘুমুলেন নাকি? একবার দোরটা খুলবেন? বড্ড বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি।

বিপদের কথা শুনেই তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলেন। একজন বুড়ো লোক লণ্ঠন হাতে করে ঘরে ঢুকলেন।

—কি হয়েছে বলুন তো। এত রাতে ডাকাডাকি করছেন কেন?

—আর দাদা কি বলব! বুড়ো হয়েছি কিনা তাই তামাকের নেশায় অস্থির হয়ে ছুটে আসতে হয়েছে।

বুড়ো বললেন, খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছি। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল, বিছানা থেকে উঠে বসতে না বসতেই মাথা ঝিম্‌ ঝিম্‌ করতে লাগল। কেন এমন হচ্ছে প্রথমটা কিছুতেই বুঝতে পারলুম না, পরে মনে হল খাবার পর তামাক না খেয়ে শুয়ে পড়েছি, তাই তো মাথা ঘুরছে। তামাক সাজতে গিয়ে দেখি টিকে ধরাবার আগুন নেই। একটু আগুনের জন্যে আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি। যদি কিছু মনে না করেন তো আমায় একটু আগুন দিন।

—বেশ লোক তো আপনি। তামাক খাবার জন্যে এত রাতে ঘুম থেকে লোককে কেউ কখনো তোলে নাকি? আর আপনি দেখছি খুব বুদ্ধিমান। আপনার হাতেই লণ্ঠন রয়েছে, তাই থেকে টিকে ধরাতে পারলেন না। হাতে আগুন নিয়ে আগুন আগুন করে পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন! বাঃ বাঃ, বেশ মজার লোক তো।

—এ-ই যাঃ, তাই তো! হাতে লণ্ঠন থাকতে আগুন খুঁজে মরছি।

বুড়ো ভদ্রলোক লজ্জায় মাথা নিচু করে চলে গেলেন। বাড়ি এসে টিকে ধরিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে গড় গড় করে হুঁকা টানতে লাগলেন।

স্বামী অদ্বৈতানন্দ একবার তীর্থদর্শনে যাবার ইচ্ছা করে গুরুর নিকট অনুমতি চান। গুরু রামকৃষ্ণদেব তখন তাঁকে এ গল্পটি বলেছিলেন। তিনি বলেন, ভগবানকে খুঁজতে লোকে তীর্থে যেতে চায়। আরে, ভগবান যে ভেতরেই রয়েছেন, এ বুদ্ধি কারো নেই। এত কাছে থাকতে লোকে দূরে গিয়ে তাঁকে খোঁজে। ঐ বুড়ো যেমন নিজের হাতে আগুন থাকতে দূরে গিয়ে লোকের বাড়িতে আগুন খুঁজে মরছে, সব মানুষই তেমনি ভগবান খুঁজে তীর্থে যেতে চায়। ঈশ্বর সবার আপন। তিনি সব সময় কাছেই থাকেন। বৃথা সময় নষ্ট করতে তীর্থে যেও না।

স্বামী অদ্বৈতানন্দ ছিলেন বুড়ো মানুষ। তীর্থ ভ্রমণে খুব কষ্ট পেতে হয়। এই কষ্টের বিশেষ কোন ফলও পাওয়া যায় না, তাই রামকৃষ্ণদেব তাঁকে তীর্থে যেতে নিষেধ করেছিলেন।

স্বামী অদ্বৈতানন্দের ছোটবেলার নাম গোপালচন্দ্র শূর। গুরু-ভাইরা তাঁকে 'বুড়ো গোপালদা' বলে ডাকতেন। গোপালদা বুড়ো বয়সে সাধু হয়েছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণদেবের চেয়েও বয়সে বড় ছিলেন।

গোপালদা সাধু হবার আগে ব্যবসা করতেন। কলকাতার

চীনেবাজারের নাম সকলেই জানে। এটি কলকাতার মধ্যে একটি নামকরা বাজার। সেই বাজারে গোপালদার দোকান ছিল। তাঁর দোকানে কাগজ বিক্রি হত। সে অঞ্চলে তাঁর দোকানের খুব নাম ছিল। অর্থাৎ তিনি একজন নামকরা ব্যবসায়ী ছিলেন।

গোপালদা বিয়ে করে সংসার-ধর্ম পালন করছিলেন। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পর সংসারের কাজ তাঁর আর ভাল লাগত না। তাঁর একজন বন্ধুর কাছে রামকৃষ্ণদেবের কথা শোনেন। কিছুদিন পর তিনি সংসার ছেড়ে দিয়ে রামকৃষ্ণদেবের নিকট চলে আসেন। সংসার ছাড়ার পর তিনি গুরুর কাছে থেকে সাধন ভজন শিক্ষা করেন।

রামকৃষ্ণদেবের শরীর যাবার পর সকলের সংগে তিনিও বরানগর মঠে যোগদান করেন। সেখানে তাঁর সন্ন্যাস হয় এবং তিনি স্বামী অদ্বৈতানন্দ নামে পরিচিত হন।

বরানগর মঠে কিছুদিন কঠোর সাধনা করেন, তারপর তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে যান। প্রথমে তিনি কাশী যান। কাশীতে পাঁচ বছর ছিলেন। এ পাঁচ বছর তিনি তপস্যা করে কাটিয়েছেন। তিনি কাশীতে যতদিন ছিলেন, ততদিন মাধুকরী করে আহার করেছেন।

মাধুকরী হল একরকম ভিক্ষা। সন্ন্যাসী লোকের বাড়ির দোরে এসে বলেন, ভবতি ভিক্ষাং দেহি। মা আমায় ভিক্ষা দাও। সাধু যে বাড়ি ভিক্ষে করতে আসবেন সে বাড়ির মেয়েরা, তাঁদের ঘরে যা রান্না হয়েছে তাই থেকে সন্ন্যাসীকে কিছু দান করেন। সন্ন্যাসী ভাত বা রুটি, ডাল, তরকারি যা ভিক্ষায় পান তাই এক সংগে মিশিয়ে খেয়ে নেন। এরই নাম মাধুকরী।

বাংলাদেশে সাধুদের মাধুকরী করতে বিশেষ দেখা যায় না। কাশী-হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থস্থানেই সাধুদের মাধুকরী করতে দেখা যায়।

তিনি হরিদ্বার, হৃষীকেশ, কেদার-বদরী, দ্বারকা, রামেশ্বর প্রভৃতি বহু তীর্থ স্থান ভ্রমণ করেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ আঁমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর আলমবাজার মঠে গোপালদা তাঁর সংগে মিলিত হন। পরে বেলুড় মঠ তৈরী হ'লে তিনি সেখানে চলে আসেন।

স্বামী অদ্বৈতানন্দ বাগানের কাজ করতে ভালবাসতেন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি এ কাজ করতেন। বেলুড় মঠেও বাগানের কাজ দেখা-শোনা করতেন।

তাঁর কাজ খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল। তিনি ফুল ও শব্জীর গাছ সুন্দর সারি বেঁধে লাগাতেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর কাজের খুব প্রশংসা করতেন।

—এস ভাই, জগৎ জুড়ে একটি জাত তৈরী করি। এই জাতির মধ্যে থাকবে কেবল প্রেম—নিঃস্বার্থ ভালবাসা। ইউরোপের জাতিরা অস্ত্রশস্ত্রে জগৎ শাসন করতে চায়। এস আমরা প্রেম ও শক্তির দ্বারা সংসারকে বন্ধন করি। সকলকে এক করে ফেলি। দূর কর স্বার্থ, সাধ, মান, ছিঁড়ে ফেল মায়ার বন্ধন।

—স্বামী প্রেমানন্দ

স্বামী অদ্ভুতানন্দ

অদ্ভুত মাস্টার, অদ্ভুত ছাত্র।

মাস্টার বলেন, পড়, ক।

ছাত্র পড়ে, কা।

মাস্টার আবার বলেন, বল্, খ।

ছাত্র পড়ে, খা।

মাস্টার ছাত্রকে ভাল করে বুঝিয়ে বলেন, তুই কা কেন বলছিস্? বল্, ক। আর খা না পড়ে পড়্ খ। বুঝলি তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ বুঝেছি।

—আচ্ছা বেশ, এবার বল্ তো ক।

—হামি বলবে?

—হ্যাঁ তুই বলবি।

—আজ্ঞে হুজুর কা।

—এই যা মলো, আবার সেই একই ভুল করলি? একটা জোরে নিঃশ্বাস ফেলে মাস্টার বললেন, নাঃ, তোকে নিয়ে আর পারব না। এই না বললি, বুঝেছি। তবে আবার ভুল করলি কেন?

ছাত্র অমনি ব্যস্ত হয়ে বললে, হুজুর, হামি আর ভুল করবে না। এবার ঠিক বলতে পারবে।

—ঠিক বলতে পারবি? বেশ, আবার মুখে মুখে বল দেখি, খ।

ছাত্র তো মহা ভাবনায় পড়ল। কি বলতে কি বলবে সে কিছুই জানে না। ব্যস্ততার মধ্যে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, খা।

মাস্টার দেখলেন একে লেখাপড়া শেখানো আর যাবে না। দুঃখ করে

বলেন, তোকে আর শেখাতে পারলুম না রে। তোর দ্বারা আর পড়াশোনা হবে না, আমাকে হার মানতে হল।

ছাত্র লজ্জায় মাথা নিচু করে চুপ করে থাকে, কোন জবাব তার মুখ দিয়ে বার হয় না।

•

এই অদ্ভুত মাস্টার আর অদ্ভুত ছাত্রটি কে জান? মাস্টার হলেন রামকৃষ্ণদেব, আর স্বামী অদ্ভুতানন্দ হচ্ছেন তাঁর ছাত্র।

মাস্টারের নাম শুনলেই মনে হয় তিনি যেন মস্ত বড় একজন পণ্ডিত হবেন, কিন্তু তা নয়। মাস্টার রামকৃষ্ণদেব লেখাপড়া বিশেষ কিছুই জানতেন না। নিজের নাম সই করতে পারতেন মাত্র।

রামকৃষ্ণদেবের শিষ্যদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন বিদ্বান লোক। এ সব কথা আগেও দু এক জায়গায় বলেছি। স্বামী অদ্ভুতানন্দ লেখাপড়া মোটেই জানতেন না। রামকৃষ্ণদেবের মনে ভারী দুঃখ হল! তাঁর সব শিষ্যেরা পণ্ডিত হবে আর লাটু মূর্খ থেকে যাবে? তাই তিনি লাটুকে পড়াতে শুরু করেছিলেন।

স্বামী অদ্ভুতানন্দকে তিনি লাটু বলে ডাকতেন, তাঁর ভাল নাম হল রাখতুরাম। ছাপরা জেলার ছোট্ট একটি গ্রামে লাটুর জন্ম হয়। ছাপরা বিহার প্রদেশের একটি জেলা।

তিনি শৈশবেই মাতাপিতৃহারা হন। ছোটবেলায় মা-বাবা মারা গেলে বড় দুঃখ পেতে হয়। গরিবের ছেলে হলে আরও বেশী দুঃখ হয়। তারা সুযোগ-সুবিধা কিছুই পায় না। লেখাপড়াও শিখতে পারে না। লাটুও ছিলেন গ রবের ছেলে। সেজন্যে তিনিও কিছুই শিখতে পারেন নি।

কথায় বলে পাখির গলায় কাঠি উঠলে তাকে আর পড়ানো যায় না। মানুষের বেলাও কিন্তু তাই। বয়সের সংগে সংগে না শিখলে পরে বুড়ো

হলে আর শেখা যায় না। রামকৃষ্ণদেব যখন লাটুকে পড়াতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁর অনেক বয়স হয়েছিল। এই বুড়ো বয়সে কি আর অ, আ, ক, খ কেউ শিখতে পারে? কাজেই তিনিও শিখতে পারলেন না।

স্বামী অদ্ভুতানন্দের জীবনে অনেক সব অদ্ভুত ঘটনা আছে। তাঁর সব কাজই যেন ছিল অদ্ভুত।

লাটু ছিলেন রামচন্দ্র দত্তের বাড়ির চাকর। রামবাবু মাঝে মাঝে রামকৃষ্ণদেবের নিকট আসতেন। তিনি যখন আসতেন তখন রামকৃষ্ণদেবের জন্যে ফল মিষ্টি নিয়ে আসতেন। লাটু এ সব ফল মিষ্টি বয়ে নিয়ে আসতেন।

লাটু ফল মিষ্টিগুলি রামকৃষ্ণদেবের নিকট রেখে চুপ করে বসে থাকতেন। রামকৃষ্ণদেবের নিকট অনেক লোকজন আসতেন। তিনি তাঁদের গল্পের ছলে অনেক উপদেশ দিতেন। লাটু বসে বসে সে সব কথা শুনতেন।

কিছুদিন পরে রামকৃষ্ণদেবের কাজের সুবিধার জন্যে লাটুকে তিনি দক্ষিণেশ্বরে রেখে দেন। লাটু দক্ষিণেশ্বরে থেকে কাজকর্ম করেন। সারাদিন পরিশ্রম করার পর সন্ধ্যা হলে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েন।

রামকৃষ্ণদেব লাটুকে ডেকে তিরস্কার করে বললেন, হঁ্যা রে লাটু, সন্ধ্যা হতে না হতেই যদি ঘুমিয়ে পড়িস্, তবে ভগবানের নাম করবি কখন বল তো?

লাটু ফ্যাল্ ফ্যাল করে গুরুর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। কোন কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরোয় না। চোখ দিয়ে শুধু ঝর ঝর করে জল ঝরে। রামকৃষ্ণদেব তাঁর মনের ভাব বুঝতে পারলেন। তারপর তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, দেখ সন্ধ্যেবেলা ভগবানকে ডাকবার সময়। সে সময় লোকজনের আসা-যাওয়াও কমে যায়, নির্জন হয়। তখন বসে জপ ধ্যান করলে মন তাতে বেশ জমে যায়। তুই তো সারাদিন পরিশ্রম

করিস, মোটেই সময় পাস্ না। সন্ধ্যেবেলা যা একটু পাস, তাও যদি ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিস তবে তাঁকে ডাকবি কখন বল দেখি ?

লাটু গুরুর কথা মন দিয়ে শুনলেন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন তিনি আর কখনো রাত্রে ঘুমুবেন না।

তারপর থেকে লাটু আর রাত্রে ঘুমোন না। সারারাত জেগে জপ-ধ্যান করেন।

যে লাটু সন্ধ্যা হতে না হতেই নিদ্রায় অভিভূত হয়ে ঢলে পড়তেন, তিনি কিনা এখন সারারাত না ঘুমিয়ে কটান ! কি অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁর !

আর একদিনের কথা।

বরানগর মঠে একবার তাঁকে কলাপাতা কেটে আনতে পাঠানো হ'ল। লাটু তো পাতা কাটতে কলা বাগানে চলে গেলেন। সকলেই ভাবলেন, কিছুক্ষণ পরেই পাতা নিয়ে ফিরে আসবেন। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যাচ্ছে, তবু লাটুর দেখা নেই।

—লাটু এতক্ষণ কলা-বাগানে কি করছে ? কখন গেছে এখনো আসে না কেন ? গুরু-ভাইদের মধ্যে একজন তাঁকে দেখতে গেলেন।

কলা-বাগানে এসে যা দেখলেন, তাতে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। লাটু পাতা কাটতে কলাগাছে কোপ মেরে গাছের দিকে এক ভাবে চেয়ে আছেন, তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছে আর মাঝে মাঝে 'হায় কি করলুম' বলে আর্তনাদ করছেন।

গুরু-ভাইটি কাছে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে জিগগেস করলেন, কি হয়েছে ভাই লাটু, তুমি অমন করছ কেন ?

—আর ভাই আমি কি করলুম দেখ। গাছের রক্তপাত করে দিয়েছি। হায় হায়, গাছের কি কষ্ট হচ্ছে দেখ !

পাতা কাটতে গাছে কোপ মারলে গাছ থেকে জল পড়তে থাকে। এই জল পড়াকে তিনি গাছের রক্তপাত বলছেন। কোমলপ্রাণ লাটু সামান্য একটি গাছের কষ্টের জন্যে কি রকম ছটফট করছেন। সাধু মহা-পুরুষরা কারুর দুঃখ-কষ্ট সইতে পারেন না। লাটু মহারাজের জীবনই তাঁর জ্বলন্ত উদাহরণ।

এ রকম আরও অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছে। এ সব ঘটনার জন্যেই তিনি অদ্ভুতানন্দ নামে বিখ্যাত হন।

স্বামী অদ্ভুতানন্দ সত্যিই অদ্ভুত মহাপুরুষ। তিনি লেখাপড়া কিছুই জানতেন না; একথা আগেই বলেছি। লেখাপড়া না জানলেও তিনি যে ধর্মের উপদেশ দিতেন, তা সবই বড় বড় শাস্ত্রের বই-এর সংগে মিলে যেত। অনেক পণ্ডিত লোকও তাঁর কাছে জটিল প্রশ্ন করে সদুত্তর পেয়েছেন।

তিনি ছোটদের খুব ভালবাসতেন। তাঁর কাছে সব সময় ছেলেদের ভীড় লেগেই থাকত। ছেলেদের জন্যে ছোলাভাজা, হালুয়া প্রভৃতি সব সময় কাছে রাখতেন; ছোটদের খাইয়ে তিনি খুব আনন্দ পেতেন।

বুড়ো হলে তিনি কাশীতেই বেশী থাকতেন, সেখানে তাঁর দেহত্যাগ হয়। কাশীতে তাঁর নামে একটি স্মৃতি-মন্দির আছে।

তুমি যদি ভালবাসা চাও তবে আগে সকলকে ভালবাস। তারপর তুমি ভালবাসা পাবে। তুমি যদি ঠকাও সকলকে, তা হলে জগত তোমায় ঠকাবে।

—স্বামী অভেদানন্দ

দুর্গাচরণ নাগ

—বাবা, বাবা, শিগগির এস।

—কেন, কি হয়েছে?

—শিগগির বাইরে এসে দেখ, উঠোন ফেটে কেমন জল বেরুচ্ছে।

বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখেন সত্যি সত্যি উঠোনের খানিকটা জায়গা ফেটে গেছে এবং সেখান থেকে গল গল করে জল উঠছে।

—অবাক কাণ্ড! কি ভাবে জল উঠল রে দুর্গা?

—আজ যে অর্ধোদয় স্নানের যোগ তা ভুলে গেলে নাকি? গঙ্গায় নাইতে কলকাতায় যেতে চাইছিলে না? দেখ, মা গঙ্গা বাড়িতে এসে আমাদের চানের সুবিধে করে দিলেন।

—বাঃ, বাঃ কি মজা, মা গঙ্গা বাড়ি এসেছেন!

দুর্গাচরণ ও তাঁর বাবা গঙ্গা চান করে মনোবাসনা পূর্ণ করলেন।

একথা ক্রমে পাড়ার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল, এবং দলে দলে লোকজন এসে চান করতে লাগল।

এ ঘটনাটি হয়েছিল দেওভোগ গ্রামে। ঢাকা জেলার ছোট্ট একটি গ্রামের নাম দেওভোগ। নারায়ণগঞ্জ থেকে আধক্রোশ পশ্চিমে তার অবস্থান।

সবেমাত্র বর্ষা শেষ হয়ে শরতকাল শুরু হয়েছে। আকাশের আনাচে কানাচে টুকরো টুকরো কালো মেঘ এখনো জমাট বেঁধে রয়েছে। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সূর্যের আলো ছিটকে এসে কচি কচি সবুজ ঘাসের ওপর পড়েছে। দূর্বা ঘাসের জলকণাগুলোতে সূর্যের আলো পড়াতে মুক্তোর মত সুন্দর দেখাচ্ছিল। পাড়াগাঁয়ের এ দৃশ্য বড়ই মনোরম। এমনি সুন্দর দিনে দুর্গাচরণ মাটির পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছিলেন।

১২৫৩ সালের ৬ই ভাদ্র দীনদয়াল নাগের বাড়িতে শাঁখ বেজে উঠলে পাড়ার ছেলেরা ছুটে এসে দীনদয়াল বাবুকে ঘিরে দাঁড়াল এবং বলল, আপনাদের খোকা হয়েছে, আমাদের খাওয়াতে হবে।

দীনদয়াল বাবু গরিব হলেও প্রথম ছেলে হওয়াতে আনন্দ করে খানিকটা ঘটা করেছিলেন, এটুকু আমরা অনায়াসেই ধরে নিতে পারি। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও এ আনন্দ উৎসব থেকে বাদ পড়ে নি।

দুর্গাচরণের জন্মের চার বছর পরে তাঁর একটি বোন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম সারাদামণি। সারদামণির জন্মের দু' বছর পরে দীনদয়াল বাবুর আর একটি মেয়ে হয়, কিন্তু চার মাস পরে মেয়েটি মারা গেল। এ ঘটনার দু' বছর পর দীনদয়াল বাবুর আর একটি ছেলে হয়। ছেলেটি জন্মাবার সংগে সংগে দুর্গাচরণের মা মারা যান। একমাস পরে শিশুটিও মায়ের সঙ্গে পরলোক যাত্রা করল!

মায়ের মৃত্যুর পর, পিসীমার ওপর তাদের মানুষ করার ভার পড়ল। পিসীমা ছিলেন বাল-বিধবা। তিনি তাঁদের নিজের সন্তানের মত লালন পালন করতে লাগলেন।

দুর্গাচরণ এখন বড় হয়েছেন। এ বয়সে স্কুলে দেওয়া প্রয়োজন।

এখন যেমন স্কুলকলেজের ছড়াছড়ি, তখন কিন্তু সে রকম ছিল না। নারায়ণগঞ্জে মাত্র একটি বাংলা স্কুল ছিল, তাও আবার প্রাইমারী স্কুল। দুর্গাচরণকে সে স্কুলে ভর্তি করানো হল। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়েই তাঁকে পড়া ছাড়তে হল। কারণ সেখানে এর বেশী আর ক্লাশ ছিল না।

দুর্গাচরণ পড়াশুনা করতে খুব ভালবাসতেন। তিনি আরো পড়তে চাইলেন, কিন্তু পড়বেন কোথায়? বাবা কলকাতায় থাকেন। সেখানে অনেক স্কুল আছে। বাবার সংগে তিনি কলকাতায় যেতে চাইলেন। কিন্তু তিনি সামান্য বেতনে চাকরি করেন। তাতে তাঁর সংসারই চলে না।

ছেলেকে কলকাতায় নিলে আর পড়ার খরচ চালানো সম্ভব নয়। কাজেই তিনি রাজী হতে পারলেন না।

স্কুলে ভর্তি হতে না পেরে দুর্গাচরণের মনে ভারী দুঃখ হল। তিনি পড়ার জন্য বড় ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। একদিন তিনি শুনলেন ঢাকা শহরে অনেক স্কুল আছে। তিনি ঢাকায় গিয়ে স্কুলে ভর্তি হতে ইচ্ছা করলেন।

নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা পাঁচ ক্রোশের পথ। ঢাকায় পড়তে যেতে হলে তাঁকে রোজ দশ ক্রোশ অর্থাৎ ২০ মাইল হাঁটতে হবে। দুর্গাচরণের বয়স তখন ১০।১২ বছর হবে। এই বয়সে এতদূরে গিয়ে স্কুল করতে কোন অভিভাবকই বলতে পারেন না। তাই পিসীমাও এ প্রস্তাবে রাজী হতে পারলেন না। দুর্গাচরণ তবু স্কুলে যাবার জন্যে জেদ করতে লাগলেন। পিসীমা বললেন, তোমার যখন পড়ার এতই আগ্রহ তখন বাড়িতেই পড়!

—না পিসীমা, বাড়িতে কি পড়া হয়?

—কি করব বল, নারায়ণগঞ্জে স্কুল থাকলে ভর্তি করিয়ে দিতুম। কিন্তু সে তো আর নেই, কাজেই তোমাকে বাড়িতে পড়ানো ছাড়া আর কি করতে পারি বল?

পিসীমা যুক্তি দিয়ে বোঝালেও দুর্গাচরণের মন মানে না। একদিন কাউকে কিছু না বলে সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই তিনি ঢাকায় রওনা হলেন। ঢাকায় এসে একটি স্কুলে পড়ার ব্যবস্থা করলেন।

দুর্গাচরণ ফিরে এসে পিসীমাকে সব বললেন। পিসীমা এবার আর তাঁকে বাধা দিলেন না। আশীর্বাদ করে বললেন, ভগবান তোমার মংগল করুন!

—পিসীমা, কাল স্কুলে যাব। সকালে খেতে দিতে হবে।

পরদিন সকালে উঠে ভাতে ভাত কিছু খেয়ে নিয়ে দুর্গাচরণ স্কুলে চললেন। পিসীমা সংগে কিছু মুড়ি বেঁধে দিয়ে বললেন, খিদে পেলে এগুলো খাস বাবা।

ঢাকা এসে দুর্গাচরণ একটি নর্মাল স্কুলে ভর্তি হলেন।

এতদূর থেকে হেঁটে এসে স্কুল করতে দেখে মাস্টাররা অবাক হয়ে যান। একদিন একজন শিক্ষক তাঁকে জিগগেস করলেন, এতদূর থেকে তুমি আস, তোমার কষ্ট হয় না।

—আমি হাঁটতে খুব ভালবাসি। আমার মোটেই কষ্ট হয় না।

—নিশ্চয় তোমার কষ্ট হয়। তুমি আমার বাড়িতে থাক।

—আপনি আমার জন্য মোটেই ভাববেন না।

ছোট্ট একটি ছেলের পড়ার আগ্রহ দেখে শিক্ষকেরা মুগ্ধ হন। তাঁরা সকলেই তাঁকে খুব ভালবাসতেন। একজন শিক্ষক আবার বেশী ভালবাসতেন। তিনি তাঁর কষ্ট দেখে নিজের বাড়িতে রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দুর্গাচরণ রাজী হলেন না।

ঢাকার পড়া শেষ করে দুর্গাচরণ কলকাতায় এসে ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হলেন। কিন্তু সেখানে বেশী দিন পড়তে পারলেন না। তিনি হোমিওপ্যাথি পড়তে আরম্ভ করেন। হোমিওপ্যাথি পরীক্ষায় পাশ করে তিনি ছোট্ট একটি ওষুধের বাক্স নিয়ে পাড়াতে গরিবদের বিনা পয়সায় ওষুধ দিতে লাগলেন।

দুর্গাচরণ ডাক্তারী করতেন বটে, কিন্তু টাকা পয়সা বিশেষ কিছুই রোজগার করতে পারতেন না। রোগী দেখতে গিয়ে কারুর কাছে কিছু চাইতে পারতেন না। নিজের থেকে যে যা দিত তাই আনতেন। তাও আবার বেশী টাকা দিলে ফিরিয়ে দিতেন।

সুরেশচন্দ্র দত্তের সংগে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। সুরেশ বাবু একদিন বললেন, ভাই দুর্গা, শুনলুম দক্ষিণেশ্বরে একজন বড় সাধু আছেন। চল তাঁকে দেখে আসি। দুর্গাচরণ বললেন, বেশ তো চল।

তারপর দু'জনেই দক্ষিণেশ্বরের দিকে রওনা হ'লেন। পথঘাট কিছুই

তাঁদের জানা নেই, রাস্তা ভুল করে তাঁদের অনেক ঘুরতে হল। বেলা দু'টোর সময় দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছলেন। রামকৃষ্ণদেবের সংগে কিছুক্ষণ আলাপ করে তাঁরা বাড়ি ফিরে এলেন।

তারপর থেকে দুর্গাচরণ প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যেতেন। একদিন তিনি রামকৃষ্ণদেবকে বললেন, আমি সন্ন্যাসী হতে চাই।

রামকৃষ্ণদেব বললেন, তুমি সন্ন্যাসী না হয়ে আদর্শ গৃহী হও।

রামকৃষ্ণদেবের কথা মত তিনি আর সংসার ত্যাগ করলেন না।

অনেকের ধারণা, সংসারে থেকে ধর্ম হয় না। কিন্তু নাগ মশায়ের জীবনী থেকে আমরা জানতে পারি, সংসার ত্যাগ না করেও ধর্মপথে উন্নতি করা যায়।

দুর্গাচরণকে পরে সকলেই নাগ মশায় বলে ডাকতেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, সারা পৃথিবী ঘুরে এলুম, কিন্তু নাগ মশায়ের মত মহাপুরুষ কোথাও দেখতে পেলুম না। গিরিশ ঘোষ বলতেন, নাগ মশায়ের মত নম্র ও বিনয়ী লোক জগতে মিলে না।

সত্যি, নাগ মশায় যেরূপ বিনয়ী ও শান্ত স্বভাবের লোক ছিলেন, তাঁর সংগে কারুরই তুলনা চলে না। সে জন্যে রামকৃষ্ণদেবের গৃহী শিষ্যদের মধ্যে তাঁকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়।

মাস্টার মশায়

(মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত)

'রামকৃষ্ণ কথামৃত' বই-এর নাম শুনেছ। রামকৃষ্ণদেব গল্পের মত সহজভাবে যে সব উপদেশ দিতেন, তার বেশীর ভাগ কথাই এই বই থেকে আমরা জানিতে পারি। বইখানি বাংলা সাহিত্যের একটি মূল্যবান গ্রন্থ।

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বইটি লিখেছেন। মহেন্দ্র বাবু স্কুল মাস্টার ছিলেন। তাঁকে সকলেই মাস্টার মশায় বলে ডাকত। কথামৃত বই লিখে তিনি অমর হয়ে আছেন।

কলকাতার সিমলা পাড়ার শিবনারায়ণ দাস লেনে মধুসূদন গুপ্তের বাড়ি ছিল। মধুসূদন গুপ্ত হলেন মাস্টার মশায়ের বাবা। ১২৬১ সালের ৩১শে আষাঢ় মহেন্দ্রনাথ এই বাড়িতে জন্মেছিলেন।

মাস্টার মশায়ের জন্মের কিছুদিন পর মধুসূদন বাবু গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের আর একটি নতুন বাড়িতে আসেন।

নতুন বাড়িতে মায়ের কোলে মহেন্দ্রনাথ বড় হতে লাগলেন। ক্রমে তিনি পাঁচ বছরে পা দিলেন।

এই বয়সে ছেলেরা খুব দুরন্ত হয়। ছুটাছুটি করে, মারামারি করে, কিন্তু মহেন্দ্রনাথ হলেন তার উল্টো। তিনি সব সময় চুপ করে বসে থাকতেন।

মায়ের আদরের ধন, চোখের মণি মহেন্দ্রনাথ। মা আদর করে ডাকতেন মণি। মণি যে শুধু মায়ের আদুরে ছিলেন তা নয়, পাড়ার সবারই আদুরে ছিলেন। শান্ত স্বভাবের জন্যে সকলেই তাঁকে ভালবাসত।

ছেলেবেলায় সবাই খেলা করে, মণিও করতেন। তাঁর খেলা ছিল,

আকাশে চাঁদ উঠলে ঘরের ছাদে উঠে চাঁদ ধরতে যাওয়া এবং বৃষ্টি হলে, বৃষ্টির জল কোথা থেকে আসছে দেখার জন্যে ছাদে উঠে লাফালাফি করা।

এমনি ভাবে মণি বেড়ে উঠতে লাগলেন। ক্রমে তাঁকে স্কুলে দেবার বয়স হল। বাবা তাঁকে নিয়ে হেয়ার স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন।

মহেন্দ্রনাথ পড়াশোনাতে খুব ভাল ছিলেন। ক্লাসের সব পরীক্ষাতেই প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতেন।

দেখতে দেখতে কয়েক বছর কেটে গেল। মহেন্দ্রনাথের প্রবেশিকা পরীক্ষা এসে গেল। পরীক্ষার ফল ভাল করার জন্যে তিনি খুব খাটতে লাগলেন।

পরীক্ষা হয়ে গেল। তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন। তারপর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়েন। এফ এ পরীক্ষার সময় একটি বিষয় পরীক্ষা না দিয়েও তিনি পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। বি এ পরীক্ষাতেও ভাল ভাবে পাশ করলেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি পাশ্চাত্য দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান প্রভৃতি খুব পড়তেন।

বি এ পাশ করার পর তিনি একটি সওদাগরী অফিসে চাকরি পেলেন। কিছুদিন পরে নড়াল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন।

মাস্টার মশায়ের পড়াবার নিয়মপ্রণালী একটু নতুন ধরণের ছিল। কোন কঠিন বিষয় তিনি খুব সহজে ও সরলভাবে বুঝিয়ে দিতে পারতেন। এ সব কারণে অল্পদিনের মধ্যে তিনি স্কুলে খুব নাম করতে পেরেছিলেন।

নড়াল থেকে কলকাতায় এসে সিটি কলেজিয়েট স্কুল, রিপন কলেজিয়েট স্কুল, মেট্রোপলিটন, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী, এরিয়ান, মডেল প্রভৃতি অনেক স্কুলে তিনি প্রধান শিক্ষকের কাজ করেছেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ, পূর্ণ ঘোষ, বিনোদ, পল্টু প্রভৃতি রামকৃষ্ণদেবের অনেক শিষ্য মাস্টার মশায়ের ছাত্র ছিলেন।

১৮৮২ সালের এক রবিবারে মাস্টার মশায় তাঁর একজন বন্ধুকে সংগে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণদেবকে দেখতে যান। রামকৃষ্ণদেবের সংগে পরিচয় হবার পর তিনি রবিবার অথবা ছুটির দিনে প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যেতেন।

রামকৃষ্ণদেবের নিকট যে সব কথা শুনতেন বাড়ি এসে তিনি সেগুলো খাতায় লিখে রাখতেন। তাই থেকেই পরে রামকৃষ্ণ কথামৃত বই লিখেছেন।

সত্য কথাই কলির তপস্যা। সত্যকে আঁট করে ধরে থাকলে ভগবান লাভ হয়। সত্যে আঁট না থাকলে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হয়ে যায়। —শ্রীরামকৃষ্ণ

রামচন্দ্র দত্ত

কোন্নগর এসেই বেলা পড়ে গেল। সূর্য আস্তে আস্তে পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ল। চারদিক থেকে সন্ধ্যা নেবে এসে ঘন অন্ধকারে ছেয়ে গেল। ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে কিন্তু রাস্তায় কোন আলো নেই। গাঢ় অন্ধকারে দু' হাত দূরের পথও দেখা যাচ্ছে না।

—কি অন্ধকার, কিছুই যে দেখতে পাচ্ছি না, এখন যাই কোথায়? পা যে আর চলে না। কি বিপদেই পড়লুম বাবা।

কথাগুলো বলতে বলতে ছোট্ট একটি ছেলে পথের ধারে একটি ঘরের বারান্দায় বসে পড়ল।

—বাইরে কে?

—আমি।

—তুমি কে? কোথা থেকে আসছ?

—আমার নাম রামচন্দ্র, হরিপাল থেকে আসছি।

ঘরের ভেতর থেকে একজন মহিলা বাইরে এসে বললেন, এতটুকু ছেলে, কি করে এখানে এলে?

—কেন, হেঁটে এসেছি।

—অতদূর থেকে হেঁটে আসতে পারলে?

—হ্যাঁ।

—তোমার বাড়ি বুঝি হরিপালে?

—না, হরিপালে এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গেছলুম।

—কোথায় যাবে?

—কলকাতায়।

—এত রাত্রে যেতে পারবে?

—তাইতো ভাবছিলুম। রাত হয়ে গেল, কি করে যাই।

ছোট্ট একটি ছেলেকে বিপদগ্রস্ত দেখে মহিলার মনে ভারী দুঃখ হল। তিনি আদর করে বললেন, খোকা, এত রাত্রে কোথায় যাবে? এখানেই থাক। কাল সকালে যেও।

রামচন্দ্রও রাত কাটাবার জন্যে যায়গা খুঁজছিলেন। মহিলা তাঁকে থাকতে বলাতে মনে মনে ভারী খুশী হলেন।

মহিলা তাঁকে ঘরের ভিতরে নিয়ে বসালেন। তারপর আবার জিগগেস করলেন, বাড়ি থেকে কখন বেরিয়েছ? তোমার মুখ বড্ড শুকনো দেখছি কেন। সারাদিন কিছু খাওয়া হয় নি বুঝি?

রামচন্দ্র মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে বললে, দুপুরে না খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি।

মহিলাটি কিছু খাবার এনে দিয়ে বললেন, নাও বাবা, খেয়ে নাও।

রামচন্দ্র খেতে লাগলেন। তারপর মহিলা আবার জিগগেস করলেন, তুমি কি রাগ করে চলে এসেছ?

—রাগ করব কেন?

—রাগ যদি না-ই করবে তবে না খেয়ে চলে এলে কেন? তুমি ছোট্ট ছেলে, তোমাকে বাড়ি থেকে একলা ছেড়ে দিয়েছে বলে তো মনে হয় না?

—আমি রাগ করি নি। তবে কি হয়েছে শুনুন, দুপুরে খেতে বসেছি, সবে মাত্র ২।১ গ্রাস মুখে দিয়েছি এমন সময় আমাকে জিগ গেস করলেন, মাংস খাও? আমি বললুম, না। তাঁরা জিগ্‌গেস করলেন, কেন খাও না? বললুম, আমার ভাল লাগে না। তাই খাই না। আমার আত্মীয়েরা আমায় বোঝাতে লাগলেন, মাংস ভাল জিনিস। কোন দিন তো খাও নি, একবার খেয়েই দেখ না। আমি বললুম, মাংস খারাপ একথা তো বলি নি,

ভাল হলেও আমার খেতে ইচ্ছে করে না। তবু জোর করে আমার থালায় মাংস দিয়ে দিলে। সে জন্যে আমি না খেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। সেই যে বেরিয়েছি আর কোথাও দাঁড়াই নি। এখানে এসে বসলুম।

পরদিন কোন্নগর স্টেশন থেকে রামচন্দ্র ট্রেনে করে কলকাতায় চলে এলেন।

রামচন্দ্রের বাবার নাম নৃসিংহপ্রসাদ দত্ত। নারকেলডাঙা কলকাতার মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ জায়গা। সেখানেই নৃসিংহপ্রসাদের বাড়ি ছিল।

শরতকাল শেষ হয়ে হেমন্ত শুরু হয়েছে। আকাশের আনাচে কানাচে কোথাও মেঘ নেই। আকাশ বেশ পরিষ্কার। ভোর বেলায় পূব আকাশ যখন লাল হয়ে ওঠে, তখন মনে হয় সারা আকাশ জুড়ে কে যেন হাসছে। আবার সূর্যের আলো যখন ঘাসের ওপরে শিশির বিন্দুগুলোতে পড়ে তখন দেখে মনে হয়, মাঠের মধ্যে কে যেন হাজারে হাজারে মুক্তো ছড়িয়ে রেখেছে।

এমনি সুন্দর দিনে নৃসিংহ দত্তের ঘর আলো করে রামচন্দ্র জন্ম নিয়েছিলেন। সেই দিনটি ছিল ১২৫৮ সালের ১৪ কার্তিক।

মায়ের কোলে রামচন্দ্র শুক্লপক্ষের চাঁদের মত বেড়ে উঠতে লাগলেন। দেখতে দেখতে আড়াই বছর কেটে গেল। এসময় হঠাৎ তার মা মারা গেলেন।

মাতৃহারা শিশু রাম আত্মীয়দের কোলে মানুষ হতে লাগলেন।

রামচন্দ্রের ছেলেবেলার খেলা ছিল, ঠাকুর গড়ে পূজো করা, কৃষ্ণের মত পোশাক পরে নাচ গান করা।

নারকেলডাঙায় শ্রীনিবাস বাবাজীর আশ্রম ও শিখের বাগান ছিল। সেখানে অনেক সাধুসন্ন্যাসী থাকতেন। রামচন্দ্র সাধুদের কাছে গিয়ে

ঠাকুরদেবতার গল্প শুনতেন। সাধুরা তাঁকে খুব ভালবাসতেন এবং আদর করে প্রসাদ খেতে দিতেন।

রামচন্দ্র প্রথমে পাড়ার একটি স্কুলে পড়েন। সেখান থেকে পরে এসেম্ব্লি ইন্‌সটিটিউসনে চলে যান। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে তিনি ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে পড়েন।

মেডিকেল স্কুল থেকে ভালভাবে পাশ করে চাকরি পেয়ে তিনি প্রতাপনগরে চলে যান। কিছুদিন পরেই তিনি বাংলা সরকারের কুইনাইন বিভাগের সহকারী পরীক্ষক নিযুক্ত হন। তারপর একজন সাহেবের কাছে রসায়ন বিজ্ঞান শিক্ষা করেন। দু'তিন বছরের মধ্যেই এ বিদ্যায় তিনি খুব নাম করে ফেলেন। তার কিছুদিন পরে কুর্চি গাছের ছাল থেকে কুর্চিসিন নামে একটি ওষুধ আবিষ্কার করেন। তাতে তাঁর সুখ্যাতি আরো বেড়ে গেল।

সিনকোনা গাছের ছাল থেকে যেরূপ কুইনাইন তৈরী হয়, সেরূপ কুর্চি গাছের ছাল থেকে কুর্চিসিন হয়। কুইনাইন জ্বরের ওষুধ আর কুর্চিসিন রক্ত আমাশয়ের ওষুধ।

একবার তাঁর মনে প্রশ্ন ওঠে, সত্যি সত্যি ঈশ্বর আছেন কি না। এ সম্বন্ধে জানবার তাঁর খুব ইচ্ছে হল। তিনি সাধু-সন্ন্যাসী, পণ্ডিত, জ্যোতিষী যাকে দেখতে পান, একথা জিগ্‌গেস করেন। কিন্তু কেউ তাঁর মনোমত উত্তর দিতে পারলেন না। পরে তিনি রামকৃষ্ণদেবের নাম শুনে তাঁর কাছে যান।

রামচন্দ্র ঈশ্বর সম্বন্ধে জিগ্‌গেস করতেই রামকৃষ্ণদেব বললেন, দিনের বেলায় সূর্য উঠলে তার আলোতে আমরা তারা দেখতে পাই না। তাই বলে কি আকাশে তারা নেই বলব? দুধে মাখন আছে। দুধ দেখলে মাখনের কথা কিছুই বলা যায় না। মাখন পেতে হলে দুধকে দই পেতে

কিছুক্ষণ নির্জনে রাখতে হয়। দইকে মন্থন করলে মাখন বেরোয়। পুকুরে বড়শি দিয়ে মাছ ধরতে হলে, যে এর আগে সে পুকুরে মাছ ধরেছে, তার কাছে খবর নিতে হয়, কি রকম মাছ, কিসের টোপ ফেললে মাছ ধরা পড়ে। আবার ছিপ ফেলার সংগে সংগেই মাছ ধরা পড়ে না। ধৈর্য ধরে ছিপ নিয়ে চুপ করে বসে থাকতে হয়। তুমি ঈশ্বর সম্বন্ধে জানতে চাও, সেও তো একই কথা। তাঁর কথা জানতে হলে, তাঁকে দেখতে ইচ্ছে করলে, ভগবানের বিষয় জেনেছেন, এরকম লোকের কাছ থেকে জেনে নিয়ে সাধন ভজন করতে হয়, তবে তাঁর দেখা পাওয়া যায়।

রামকৃষ্ণদেবের কথা শুনে রামচন্দ্রের মনে আর কোন সন্দেহ রইল না। তিনি তাঁর কাছ থেকে সাধন প্রণালী শিখে নিয়ে ভগবানের উপাসনায় মন দিলেন।

নারকেলডাঙার নিকটেই কাঁকুড়গাছি গ্রাম। সেখানে যোগোদ্যান নামে একটি আশ্রম আছে। এই আশ্রমটি রামচন্দ্র দত্ত প্রতিষ্ঠা করেন।

শরীরটাকে খুব মজবুত করতে শিখতে হবে। দেখছিস নে এখনো রোজ আমি ডামবেল কসি। রোজ সকাল সন্ধ্যায় বেড়াবি ও শারীরিক পরিশ্রম করবি। সব বিষয়ে পরের ওপর নির্ভর করলে চলবে কেন? দেহ ও মন সমান ভাবে উন্নত হওয়া চাই।

—স্বামী বিবেকানন্দ

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

—বড্ড তেষ্টা পেয়েছে জেঠাই মা।

—জল খাবি ?

—না।

—তবে কি খাবি ?

কোন কথা না বলে গিরে চুপ করে রইল। সে কি চায়, জেঠাইমা কিছুই বুঝতে পারলেন না। একটু পরে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

—ও মা, কি হল রে ? কাঁদছিস কেন ? জল খেতে চাস তো জল এনে দিচ্ছি।

জেঠাইমা ছুটে গিয়ে এক গেলাস জল এনে দিলেন। জল খাব না বলে গেলাসটি জেঠাইমার হাত থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে।

জেঠাইমা রেগে তাকে বকতে লাগলেন। এমন সময় তার বাবা এসে উপস্থিত হলেন। বাবাকে দেখে সে আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল।

—গিরে কাঁদছে কেন বউদি' ?

—কি জানি ঠাকুরপো, জিগ্‌গেস করলে বলে তেষ্টা পেয়েছে। জল এনে দিলুম, তাও খেলে না।

—কি হয়েছে রে, কাঁদছিস কেন ?

—তেষ্টায় বুক ফেটে গেল বাবা।

—তেষ্টা পেলে জল খাচ্ছিস না কেন ?

—না বাবা, জল খাবার তেষ্টা নয়।

—তবে কিসের তেষ্টা ?

—শশা খাবার তেষ্টা।

ছেলের কথা শুনে নীলকমলবাবু হেসে ফেললেন, একটু পরে হাসি সামলে নিয়ে বললেন, বেশ তো শশা খেতে চাস এক্ষুণি আনিয়ে দিচ্ছি।

—না বাবা, বাজারের শশা খাব না।

—বাজারের শশা খাবি না তো কোন্ শশা খাবি ?

—জ্যেঠাইমার বাগানে যে শশা খড় দিয়ে বাঁধা আছে, সেটি খাব।

—কি হতভাগা ছেলে! ঠাকুরের জন্যে মানত করে যে শশা রেখেছি, সে শশা না খেলে তোমার তেষ্টা মিটবে না! ছেলের লোভ দেখ না! তাই তো ভাবি তেষ্টা পেয়েছে জল দিলেও খায় না কেন? ঠাকুরপো, কক্ষনো তুমি ওকে ঐ শশা দিতে পারবে না।

—বউদি', গিয়ে ছোট্ট ছেলে। এতটুকু ছেলে যে জিনিসের জন্যে কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেললে—মাথাখুঁড়ে বাড়ি শুদ্ধ সবাইকে অস্থির করে তুললে, তোমার ঠাকুর কি সে শশা কখনো খাবেন ?

—ঠাকুর-দেবতা মানে না। ছেলে আমার নিকুচি করেছে। ঠাকুর-পো, আদর দিয়ে ছেলেটার মাথা খেলে!

কথাগুলো বলতে বলতে জ্যেঠাইমা ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে বাগান থেকে শশাটি এনে ছেলের হাতে দিলেন।

গিরিশ জেঠাইমার বাগানের শশা খেয়ে শান্ত হল।

ছোট্ট একটি ঘটনা থেকেই বুঝা যায়, গিরিশ কেমন জেদী ও বুদ্ধিমান ছেলে।

গিরিশ যখন যা বায়না ধরতেন যতক্ষণ তা না পেতেন, বাড়ি মাথায় করে তুলতেন। কেউ তখন শান্ত হতে বললে তিনি আরও বেশী করে দুষ্টুমি করতেন। ভূত বা বাঘ ভালুকের ভয় দেখালে ভূত দেখতে আঁধার রাতে এবং ভালুকের সন্ধানে জংগলে ছুটে যেতেন। এমন দুরন্ত ছেলেকে নিয়ে বাবা বড়ই মুশকিলে পড়লেন।

বাবা দেখলেন ছেলেকে বকে বা মারধোর করে কিছু হবে না। তাতে সে আরও বেয়াড়া হয়ে উঠবে। তার চেয়ে ছেলে যখন যা চায়, সম্ভব হলে তাই দেওয়া ভাল। তিনি ছেলের আবদার সব সময় শুনতেন। কিন্তু ছেলে অন্যায় করলে আবার শাস্তিও দিতেন।

দুরন্ত গিরিশ দিন দিন বড় হতে লাগলেন। তিনি আট বছরে পা দিলেন। নীলকমলবাবু ছেলেকে স্কুলে দেবার জন্যে ব্যস্ত হলেন। গিরিশ ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুলে ভর্তি হলেন।

স্কুলে তাঁর কয়েকজন বন্ধু জুটে গেল। তাদের নিয়ে একটি দল গড়ে তুললেন। দুরন্ত ছেলের দলের লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি সব সময় লেগেই থাকে। তাদের জ্বালায় মাস্টার মশায়রা অস্থির হয়ে ওঠেন। শুধু কি তাই, পড়ার সময় গিরিশ এটা কি ওটা কি, এভাবে প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন করে হয়রান করে তুলতেন। ক্লাসের মধ্যে অত প্রশ্ন করা শিক্ষকরা পছন্দ করতেন না। তাঁরা বিরক্ত হয়ে তাঁকে ধমক দিয়ে বলতেন, পড়াশুনো কিছু করবে না, সারাদিন দাংগাবাজি করে বেড়াবে আর স্কুলে এসে আমাদের জ্বালিয়ে খাবে। যা বলছি তাই শোন্, কিচ্ছু জিগ্গেস করতে পারবি না।

মাস্টারের ধমক খেয়ে গিরিশের মনের প্রশ্ন মনেই থেকে যেত। জবাব না পেয়ে তাঁর জিজ্ঞাসু মন আরও উতলা হয়ে উঠত।

গিরিশ বড় হয়ে তাই দুঃখ করে বলেছিলেন, ছেলেবেলায় স্কুলে পড়ার সময় আমার মনে যে সব প্রশ্ন উঠত, মাস্টার মশায়রা যদি সে সব প্রশ্নের উত্তর দিতেন, তবে আমি অনেক কিছু জানতে ও শিখতে পারতুম।

গিরিশের বাবার নাম নীলকমল ঘোষ। একথা আগেই বলেছি। নীলকমলবাবু একটি সদাগরী অফিসে কাজ করতেন; তিনি বড় ভাল লোক ছিলেন। কোন লোক বিপদগ্রস্ত হয়ে তাঁর কাছে এলে তিনি সব সময় তাদের সাহায্য করতেন।

একবার একটি লোক অভাবে পড়ে তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে আসে। লোকটির সংসারের অভাবের কথা শুনে নীলকমলবাবুর ভারী দুঃখ হল। তিনি নিজের অফিসে একটি কাজ দিয়ে তাকে বললেন, তোমার বেতন থেকে মাসে পাঁচ টাকা করে আমার কাছে জমা রাখতে হবে। লোকটির ইচ্ছা না থাকলেও এ প্রস্তাবে সে রাজী হল।

নীলকমল পরোপকারের নামে বেশ দু'পয়সা করে নিলে, বলে লোকেরা তাঁর নামে নিন্দা করতে লাগল।

তিন চার বছর কাজ করার পরই সেই লোকটি হঠাৎ মারা যায়। তার মৃত্যুতে পরিবারের লোকদের বিষম বিপদ হল। বাড়িতে হাহাকার পড়ে গেল। তিনি সামান্য যা রোজগার করতেন, তাতেই কোন প্রকারে তাঁর সংসার চলত। এখন তাও বন্ধ হল।

নীলকমলবাবু তাঁর পরিবারকে ডেকে এনে বললেন, তোমার স্বামী পাঁচ টাকা করে আমার কাছে জমা রাখত। যে কয়দিন কাজ করেছে তাতে এত টাকা এবং তার সুদে এত টাকা হয়েছে। এই টাকা নিয়ে তোমার সংসার চালাও। বিপদগ্রস্ত একটি পরিবারকে তিনি এভাবে রক্ষা করলেন।

গিরিশচন্দ্রের মা ঠাকুর-দেবতার পূজো করতে খুব ভালবাসতেন। গৃহদেবতা শ্রীধর ঠাকুরের পূজো না করে তিনি জলগ্রহণ করতেন না।

মা ছেলেকে ভালবাসতেন। একথা নতুন নয়, সকলেই জানে। কিন্তু গিরিশের মা ছেলেকে যেমন ভালবাসতেন তেমনি আবার কোন অন্যায় কাজ করলে শাস্তিও দিতেন।

সাধারণত দেখতে পাওয়া যায়, ছেলের দোষের কথা মাকে বললে মা ছেলের দোষের বা অন্যায়ের কথা না শুনে ছেলের পক্ষ নিয়ে ঝগড়া করেন। কিন্তু গিরিশের মা সেরূপ ছিলেন না। ছেলের নামে কেউ নালিশ করলে তিনি তাঁকে খুব শাসন করতেন।

আট বছরে মা ও চোদ্দ বছরের সময় গিরিশের বাবা মারা যান।

বাবার মৃত্যুর পর গিরিশচন্দ্র আরও দুরন্ত হয়ে উঠলেন। অভিভাবক বলতে তখন আর কেউ ছিল না। কাজেই কাউকে তিনি গ্রাহ্য করতেন না। দুষ্ট ছেলেদের সংগে মিশে স্কুলে না গিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন।

এভাবে চার বছর কেটে গেল। গিরিশের বয়স হল আঠার।

লেখাপড়াতে মনোযোগ দেবার জন্যে তাঁর আত্মীয়েরা কত চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। গিরিশচন্দ্রকে কোন কাজের কথা বললে তিনি তার উল্টোটিই করতেন, একথা আগেই বলেছি। পড়াশোনার কথা বললে তিনি এমনি বেঁকে দাঁড়াতেন যে, কারুরই ক্ষমতা ছিল না তাঁকে পড়াতে পারে। আত্মীয়স্বজনেরা হতাশ হয়ে তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তিত হলেন। যা হোক, বন্ধুদের পরামর্শ মত শেষটায় প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন। পড়াশোনা না করে পরীক্ষা দিলেই তো আর পাশ করা যায় না, সুতরাং গিরিশও পাশ করতে পারলেন না।

গিরিশচন্দ্রের লেখাপড়া এখানেই শেষ হল। পড়াশোনা নেই, কোন কাজও নেই। এখন সময় কাটবে কিসে? ভবঘুরের দলে মিশে তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

দুরন্ত ছেলের দল দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে পাড়া মাৎ করে বেড়াত আবার পাড়াতে কারুর বিপদ হলে বা অসুখ করলে সেবার কাজে তারাই এগিয়ে যেত।

১৮৬৭ সালে গিরিশচন্দ্র তাঁর দলের ছেলেদের নিয়ে একটি যাত্রাদল গড়ে তুললেন। মধুসূদনের রচিত শর্মিষ্ঠা নাটকটি প্রথম অভিনয় হবে ঠিক হল। ছেলেদের মধ্যে রিহার্সেলের সাড়া পড়ে গেল।

গিরিশচন্দ্র এ সময় কয়েকটি গান লিখে ফেললেন। গান কয়টি এ নাটকে গাওয়া হল। গান শুনে সকলেই খুশী।

গিরিশের যাত্রাদলটি কিছুদিনের মধ্যেই বেশ নাম করে ফেললে। বেশী বেশী করে টাকা দিয়ে লোকেরা এ দলকে নিমন্ত্রণ করতে লাগল।

পাড়ার সকলেই বলাবলি করতে লাগল, ডানপিটে ছেলেদের একটি কাজ জুটল।

১৮৭৯ সালে গিরিশচন্দ্র ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অভিনেতারূপে প্রবেশ করলেন। অভিনয় করতে করতে তিনি নাটক লিখতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর রচিত নাটকগুলো অভিনয় হতে লাগল। দেখতে দেখতে তাঁর লেখা বইএর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। নাটকের রাজা বলে তাঁকে সকলেই সম্মান দিতে লাগল।

গিরিশদের পাড়ায় দীননাথ বসু থাকতেন। দীননাথ বাবু রামকৃষ্ণ দেবের শিষ্য। রামকৃষ্ণদেব মাঝে মাঝে তাঁর বাড়িতে বেড়াতে আসতেন।

১৮৮৫ সালের কথা।

একদিন রামকৃষ্ণদেব দীননাথ বসুর বাড়িতে বেড়াতে এলেন। গিরিশ শুনলেন পাড়াতে একজন অদ্ভুত সাধু পরমহংস এসেছেন। দীননাথের সংগে গিরিশচন্দ্রের আগেই আলাপ ছিল। বন্ধুর বাড়ি গিয়ে অদ্ভুত সাধুটিকে দেখতে তাঁর বড্ড ইচ্ছে হল। তিনি একজন বন্ধুর সংগে দীননাথের বাড়ি গেলেন।

গিরিশ কোন দিনই সাধুদের ভক্তি বা শ্রদ্ধা করতেন না, বরং সাধু দেখলে ঠাট্টা-তামাসাই করতেন। পরমহংস নাম শুনে তিনি মনে করেছিলেন নিশ্চয় কোন অদ্ভুত রকমের সাধু হবেন। তাই তাঁকে দেখতে তাঁর ইচ্ছে হল।

রামকৃষ্ণদেবের চালচলন বা আচার-ব্যবহার কোন দিনই অদ্ভুত রকমের ছিল না। এমন কি, তিনি সাধুর পোষাক গেরুয়া কাপড় পর্যন্ত পরতেন না। সাধারণ লোকের মতই তিনি থাকতেন। গিরিশ অদ্ভুত সাধু

দেখতে এসে কিছুই দেখতে পেলেন না। কাজেই, পরমহংসদেবকে তাঁর মোটেই ভাল লাগল না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তিনি চলে এলেন।

আর একদিনের কথা।

বলরাম বোসের বাড়িতে খুব ধুমধাম। একজন নামকরা গাইয়ে কীর্তন করবেন। তাই এত ধুমধাম ও আনন্দ। কাতারে কাতারে লোক এসে বাড়ি ভর্তি করে দিলে। বড় গায়কের নাম শুনে গিরিশচন্দ্রও এলেন। কিছুক্ষণ পরে রামকৃষ্ণদেব এসে ঘরে ঢুকলেন। রামকৃষ্ণদেবকে দেখে গায়ক ও উপস্থিত লোকেরা সকলেই খুব খুশী।

গান শুরু হল। গিরিশচন্দ্র ভিড়ের মধ্যে একটু জায়গা করে নিয়ে বসে পড়লেন। গান যখন খুব জমে উঠেছে তখন রামকৃষ্ণদেব সমাধিস্থ হন। রামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধে এতদিন গিরিশের যা ধারণা ছিল, আজ তাঁর ভাব-সমাধি দেখে সব উল্টে গেল। তিনি যে সামান্য লোক নন, এখন তাঁর বিশ্বাস হল।

এ ঘটনার কিছুদিন পর গিরিশচন্দ্র চৈতন্যলীলা নাটক লেখেন। চৈতন্য-লীলা নাটকে তিনি রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে নিজের মনোভাব প্রকাশ করেছেন।

চৈতন্যলীলা নাটক দেখতে রামকৃষ্ণদেব একদিন ষ্টার থিয়েটারে যান। সেদিন আবার তাঁর সংগে গিরিশচন্দ্রের দেখা হল। গিরিশের শরীর সেদিন ভাল ছিল না। তিনি রামকৃষ্ণদেবের বসার ব্যবস্থা করে দিয়েই চলে যান। রামকৃষ্ণদেবের সংগে অল্প কিছুক্ষণের আলাপেই তিনি মুগ্ধ হন।

রামকৃষ্ণদেবের ওপর তাঁর ভক্তি-বিশ্বাস দিন দিন বাড়তে লাগল। তার সংগে দেখা করতে তিনি মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরেও যান।

গিরিশচন্দ্রের মনে এই সময় খুব অশান্তি হয়। তিনি রামকৃষ্ণদেবের কাছে গিয়ে জিগ্‌গেস করলেন, আমার কি হবে? আমার মনে মোটেই শান্তি নেই।

রামকৃষ্ণদেব বললেন, ভগবানের নাম জপ কর্, মনে শান্তি পাবি।

—আমার অত সময় নেই।

—সময় একটু করে নিতে হয়।

—কখন সময় করব?

—সব কাজের সময় হয় আর তাঁকে ডাকবার সময় হয় না? এ কি কাজের কথা হ'ল?

—আমার নাওয়া-খাওয়ার সময় ঠিক থাকে না। তাও ভুলে যাই। আবার ভগবানকে ডাকতে বলছেন? এ আমার দ্বারা হবে না।

—নাওয়া-খাওয়া কাজ-কর্ম তো সকলেই করে। এ ছাড়া কি লোকে আর কাজ করে না? ওর মধ্যেই সময় করে নিয়ে দু' বেলা তাঁর নাম কর।

—দু' বেলা? না, কক্ষণো পারব না।

—বেশ তো, দু' বেলা না পারিস, একবেলা কর।

—তাও পারব না।

—আচ্ছা, এক বেলাও যদি না পারিস তবে শোবার আগে একবার ভগবানের নাম নিয়ে শুয়ে পড়বি।

—আমায় কেন মিছামিছি এ সব কথা বলছেন? জানেন তো নাটক তামাসা স্ফূর্তি করে আমোদ নিয়ে দিনরাত বেহুঁশ হয়ে থাকি। আমার ওসব কিছুই মনে থাকবে না। কাজেই আমাকে ও-কথা আর বলবেন না।

—সারা দিনের মধ্যে একটি বারও যদি ভগবানকে ডাকতে না পারিস তবে কি করে হবে বল্ দেখি।

—তা আমি জানি না।

—তাই তো বড্ড ভাবনায় ফেললি! আচ্ছা, তোর ভার অন্যকে দিতে পারবি?

গিরিশ একটুখানি চুপ করে থেকে বললেন, সে আবার কি?